চাঁদমামা

অগাষ্ট ১৯৭৪

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন ও স্ক্যান করেছেন : ঝাড়গ্রাম ডেভিলস

এডিট করেছেন : সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

Photo by: **K. R. PRASAD**

REFLECTION

পেটের গোলমাল?
সে আবার কি বাপু?
কোনদিন শুনিনিতো!

ডাবর
গ্রাইপ
ওয়াটার

প্রত্যেক মায়ের কাছে
তার শিশুর মতন প্রিয়

শিশুদের বদহজম, অম্বল,
পেটব্যথা, বায়ু ও দাঁত উঠার
সময় ব্যথার
একটি সুস্বাদু
সুনিশ্চিত
সমাধান

ডাবর (ডাঃ এস. কে. বর্ম্মন) প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-২৯

প্রত্যেক গ্রন্থালয়ে
রাখার যোগ্য

★

'SONS OF PANDU'
Rs. 5–25

'THE NECTAR OF THE GODS'
Rs. 4–00

ইংরাজীতে রচিত ঃ লেখিকা
শ্রীমতী মধুরম্ ভুতলিঙ্গম্

উপহার দেওয়ার ও সংগ্রহ
করে রাখার মত বালক-
বালিকাদের উপযোগী গ্রন্থ

★

আজকেই যোগাযোগ করুন ঃ

ডল্টন এজেন্সীস
চাঁদমামা বিল্ডিংস
মাদ্রাজ-৬০০ ০২৬

এখন
পাওয়া যাচ্ছে
স্কলার

ব্ল্যাকবার্ড-এর তৈরি
ছাত্রদের
জন্য সেরা কলম

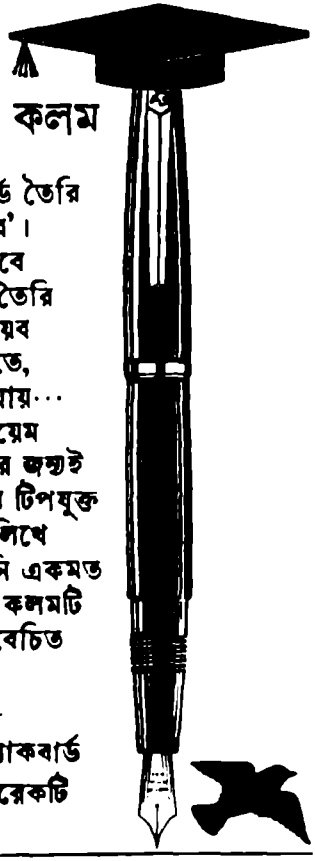

এখন ব্ল্যাকবার্ড তৈরি করেছে 'স্কলার'। এটি বিশেষভাবে ছাত্রদের জন্য তৈরি হাল্কা এর অবয়ব চমৎকার দেখতে, সহজেই ধরা যায়··· রেশমী মোলায়েম তরতরে লেখার জন্যই সরু ইরিডিয়াম টিপযুক্ত নিব। দেখুন, লিখে দেখুন। আপনি একমত হবেন যে এই কলমটি সেরা বলে বিবেচিত হবে!

স্কলার পেন—
বিশ্ববিখ্যাত ব্ল্যাকবার্ড
ফ্যামিলির আরেকটি
উন্নত কলম।

heros'-SI-132A BEN

বি. নাগি রেড্ডী নিবেদিত
বিজয়া ও সুরেশ কম্বাইন্স এর
প্রেমনগর
জেমিনীকৃত ইস্টম্যান কালার
ছুয়াত্তরের সাড়া জাগানো চলচ্চিত্র
রাজেশ খান্না ও হেমা মালিনী
প্রথম দু'জনে একসঙ্গে একটি অপূর্ব্ব রোমান্টিক প্রেমকাব্যে
আর সঙ্গে রয়েছে খ্যাতনামা চিত্রতারকাদের সমারোহ
পরিচালনা : কে. এস্. প্রকাশ রাও সঙ্গীত : এস্. ডি. বর্মণ
প্রযোজনা : ডি. রামা নাইডু
প্রেমনগর—দু'জনের এক আশ্চর্য্য প্রেম চিহ্ন...
স্বপ্ন রূপ নিল বাস্তবে...
CW/VS/4/74 SEN

আমাদের
সবার ভাল লাগে

চাঁদমামা

তোমারও লাগবে

ছোট বড় সবাই চাঁদমামা ভালবাসে।
পত্রিকাটি বেরোয়—বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাতী, তেলুগু, কন্নড, তামিল, মালয়ালম্ আর ইংরেজী মোট দশটি ভাষায়।

মন ভুলানো ছবি আর গল্পেতে ঠাসা।
চাঁদমামা ছোটদের মাসিক পত্রিকা—
কত ছোট হবে বড়, কত বড় হবে ছোট।
আজকেই চাঁদমামা কেনো।

গ্রাহক হবার জন্য যোগাযোগ করুন : ডন্টন এজেন্সীস, চাঁদমামা বিল্ডিংস, মাদ্রাজ-৬০০ ০২৬

কোলে

ক্রীম ক্র্যাকার

বিস্কুট

মিল্ক টফি

লাজেন্স

ল্যাকটোবন্‌বন্‌

আচার...
জ্যাম, জেলী, "সস"
স্কোয়াশ ও ভিনিগার

KB-7/74 B

নির্মাতা :—
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ,
কলিকাতা-৭০০০১০

রাম আর শ্যামের অ্যাডভেঞ্চার
ডাইনীবুড়ীর সঙ্গে মোলাকাৎ
একদিন এক রাতের বেলায় ঘুরঘুটে অন্ধকার, দেখতে পেল ওরা দুজন ছোট্ট কুঁড়ে বনের ধার।
চুপচাপ সব চারিদিকে, কোথাও নেই মানুষজন, খরগোস আর ব্যাঙের শুধু ঘোরাঘুরি সারাক্ষণ
হঠাৎ তাদের যেই না দেখা অবাক কাণ্ড একি, খরগোস আর ব্যাঙের দলে বলছে কথা দেখি।
"বাঁচাও ভাই আমাদের" কইল কেঁদে তারা, "মানুষ ছিলাম, ডাইনীবুড়ি করলে এমনধারা।"
এমন সময় সোঁ সোঁ আওয়াজ সারা জঙ্গল জুড়ে, ঝাঁটায় চেপে, ভীষণ বেগে ডাইনী এল উড়ে।
বললে ডাইনী, "তোরা এখন আমার হাতের মুঠোয়, বানাবো ব্যাঙ, থুপথুপিয়ে, ছুরবি তোরা ছুটোয়।"
বিপদ দেখে ওরা দুজন তখন বুদ্ধি করে, দুটো প্যাকেট পপিন্স নিয়ে দেখায় তুলে ধরে।
পপিন্স পেয়ে ডাইনীবুড়ি খুশী হল বেড়ে, সেই খুশীতে সব্বাইকে তখখুনি দেয় ছেড়ে।
PARLE
POPPINS
MIXED FRUITY SWEETS
খেতে ভাল
দেখতে ভাল
ভাবতে ভাল
মিষ্টি ফলার পার্লে পপিন্স
everest/500/PP-BN

চাঁদমামা

সংস্থাপক : বি. নাগি রেড্ডি
নিয়ন্ত্রণ : চক্রপানি

এবারের বেতাল কথার বিষয়বস্তু অর্থ বনাম বন্ধুত্ব। অর্থের দিক থেকে সম পর্যায়ে না থাকলে উভয় পক্ষের বন্ধুত্বের গভীরতা অটুট থাকে না।

কোশল দেশের প্রত্যেক গ্রামপ্রধান ঘুষ খায়। কেউ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সাহস পায় না, কারণ গ্রাম প্রধানেরা নাকি রাজার শ্যালক। অল্প লোককে কিছু সময়ের জন্য ঠকানো যায় কিন্তু বেশি লোককে সব সময় ঠকানো যায় না। তারই প্রমান এই 'রাজার শ্যালক' কাহিনীতে আছে।

খণ্ড ৩ আগষ্ট ১৯৭৪ সংখ্যা ২

CHITRA

অমর বাণী

সৎসঙ্গাৎ ভবতি হি সাধুতা খলানাম্,
সাধুনাং ন হি খলসঙ্গমাৎ খলত্বম্,
আমোদং কুসুমভবং মৃদেব দত্তে,
মৃদ্‌গন্ধং ন হি কুসুমানি ধারয়ন্তি। ॥ ১ ॥

[ভাল লোকের সঙ্গ পেয়ে খারাপ লোক ভাল হয় কিন্তু খারাপ লোকের সঙ্গে থাকলেও ভাল লোক খারাপ হয় না। ফুলের উপর যে মাটি পড়ে সে মাটিতে ফুলের গন্ধ লাগে কিন্তু মাটিতে পড়া ফুলে মাটির গন্ধ লাগে না।]

কর্পূরধূলিরচিতাল বালঃ,
কস্তূরিকা কুমকুম দোহদশ্রীঃ,
পাম্বীরনীরৈ রভিশিচ্যমানঃ,
প্রাঞ্চং গুণম্ মঞ্চতিকিংপলাণ্ডুঃ ? ॥ ২ ॥

[পেঁয়াজ গাছের গোড়ায় কর্পূরের গুঁড়ো দিয়ে, গাছে কস্তূরী আর কুম্‌কুমের লাল রং লাগিয়ে, ঐ গাছের গোড়ায় আতর ঢাললেও পেঁয়াজ কি তার নিজের গন্ধ হারায় ?]

বিদ্যয়া বিমলয়া পলংকৃতো
দুর্জনঃ সদসিমাস্ত কশ্চন ;
"সাক্ষরাঃ বিপরীততাং গতাঃ
কেবলং জগতি তেপি রাক্ষসাঃ।" ॥ ৩ ॥

[স্বচ্ছ লেখাপড়া জানা সত্ত্বেও দুর্জনের সভায় একজনও থাকে না, ঐ ধরণের লোকদের সাক্ষরদের মহলে মাথা নিচু করে রাক্ষসদের মত থাকতে হয়।]

যক্ষপর্বত

পঁচিশ

[খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত এবং মণিভূষণ যেখানে ছিল সেখানে এক রাক্ষসী এসেছিল। রাক্ষসীর স্বামীর কাছ থেকে জীবদত্ত যক্ষপর্বতের অনেক রহস্য জানতে পারল। মধ্যরাত্রে মণিভূষণ চমকে উঠে ভীষণ ভয় পেয়ে জীবদত্ত ও খড়্গবর্মাকে ডেকে তুলে জানাল যে রাক্ষসবাহিনী আসছে। তারপর···]

মণিভূষণের আর্তনাদ শুনে জীবদত্ত উঠে পড়ল। খড়্গবর্মার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে মণিভূষণকে অভয় দিয়ে বলল, "মণিভূষণ তোমার আর কোন ভয়ের কারণ নেই। ওদের বাহিনীর দুজন রাক্ষস এসেছিল বটে, তবে আমি ওদের জানিয়ে দিয়েছি যে তুমি যক্ষ মণিরঞ্জিত নও, তুমি তার সামান্য চাকর। আমার কথা শুনে ওরা চলে গেছে।"

কিন্তু তার পরেও মণিভূষণের সে রাত্রে আর ঘুম হল না। সকাল পর্যন্ত ভয়ে তার চোখ খোলা ছিল। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত উঠে পড়ল। সবাই সকালের কাজকর্ম সেরে ফিরে এলো সেই রথাকৃতি নৌকার কাছে।

নৌকা চালাতে লাগল মণিভূষণ। আধ ঘণ্টা পরে নৌকা নদীর এক তীরে ভিড়ল।

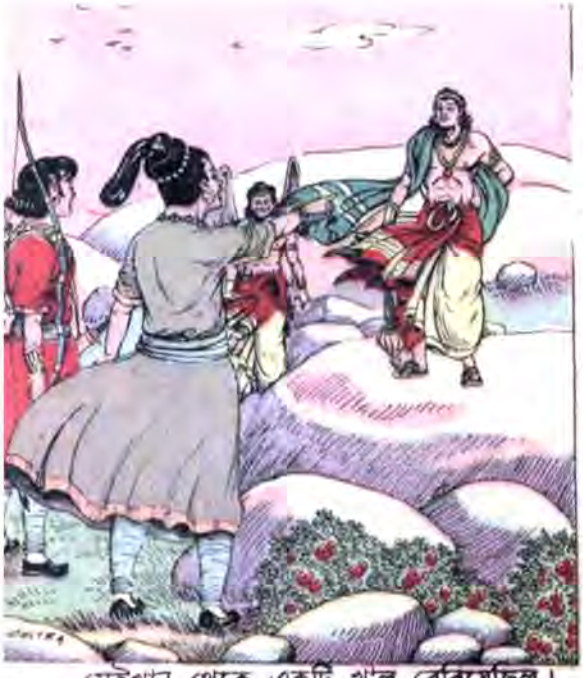

সেইখান থেকে একটি খাল বেরিয়েছিল। সেই খালে নৌকাটা ঢুকল। কিছুক্ষণ পরে মণিভূষণ খালের ধারে নৌকা ভিড়িয়ে সামনের দিকে দেখিয়ে বলল, "এই হল যক্ষপর্বত। এখন আপনারা নাবতে পারেন। আরে! এই তো আমার প্রভু মণিরঞ্জিত। আমাদের সঙ্গে দেখা করতে স্বয়ং মণিরঞ্জিত এসে গেছেন। ঐতো ওখানে দাঁড়িয়ে।" খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত নৌকা থেকে নিচে নাবল। পাহাড়ের দিকে মাথা তুলে তাকাল। পাহাড়ের উঁচু নিচু অংশের একটিতে এক যক্ষ হাতে এক গদা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঐ যক্ষ এক দৃষ্টিতে খড়্গবর্মা ও জীবদত্তের দিকে তাকাচ্ছিল। মণিভূষণ পথ দেখাতে দেখাতে এগিয়ে যাচ্ছিল। তাকে অনুসরণ করছিল খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত।

পাহাড়ে উঠতে উঠতে খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত উপরের দিকে তাকাচ্ছিল। যাদের দূর থেকে দেখেছিল, তারা কাছে এলে তাদের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঐ যক্ষ মণিরঞ্জিত বলল, "খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত আপনাদের সাহসের বলিহারি। সাহস ভাল কিন্তু দুঃসাহস ভাল নয়। আপনাদের পাখনা গজিয়েছে মনে হচ্ছে। যাক যারা দুঃসাহসী তাদের কাছে এসব কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।"

জীবদত্ত মণিরঞ্জিতের পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত তাকিয়ে হাসতে হাসতে তাকে বলল, "মণিরঞ্জিত, তুমি খুব ভাল ফাঁদ পেতেছ। রাজকুমারী পদ্মাবতীর মনে একটা বিশ্বাস এনেছিলে। সেটা হল এখানকার পাথরের রথ যে নাড়াতে পারে সে একজন মহাবীর। সেই রথ নাড়াতে যারা আসে তাকে মেরে ফেল। তোমার এই ফাঁদ আজ তোমার গলার ফাঁস হয়েছে। কোই দেখি সেই অপহরণ করে আনা রাজকুমারীদের? কোথায় রেখেছ? পদ্মাবতী ও বসন্তকুমারী কোথায়? আর ঐ পাথরের রথটাই বা কোথায়?"

ওর কথা শুনে রেগে গিয়ে মণিরঞ্জিত গদা তুলে মারতে যেতেই খড়্গবর্মা তর-

বারি ধরে বলল, "মণিরঞ্জিত, এখনই আমাদের মেরে ফেলতে যাচ্ছ কেন? আমরা যদি ঐ রথ নড়াতে না পারি তখন আমাদের মেরে ফেলো। বসন্তকুমারীর যে তোমার সম্পর্কে কি মত জানিনা তবে পদ্মাবতী যে তোমাকে মহাবীর মনে করে, সে যে তোমাকেই বিয়ে করবে সে ব্যাপারে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নেই। তাই বলছিলাম আগে চল, দেখাও পাথরের ঐ রথ কোথায় আছে। তারপর যা হয় হবে।"

মণিরঞ্জিতের রাগের আগুনে যেন ঘি পড়ল। কিন্তু তার কিছু বলার আগেই মণিভূষণ তাকে বলল, "তাড়াহুড়ো করো না মণিরঞ্জিত। এই যুবকদের আগে পাথরের রথের কাছে নিয়ে যাও।"

মণিরঞ্জিত একটু দমে গেল। এগিয়ে যেতে লাগল। তাকে অনুসরণ করল সবাই। কিছুক্ষণ পরে ওরা এক সমতল জায়গায় পৌঁছাল। সেই অংশের নিচের দিকে বহু ফুল আর ফলের গাছ।

সেই ফুল বাগানের মাঝে কাছাকাছি পাশাপাশি রথাকৃতি দুটো অট্টালিকা আছে। ঐ দুটোর একটির ছাদে দাঁড়িয়ে পদ্মাবতী ও বসন্তকুমারী খড়্গবর্মা ও জীবদত্তের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। জীবদত্ত ওদের দিকে একবার তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল,

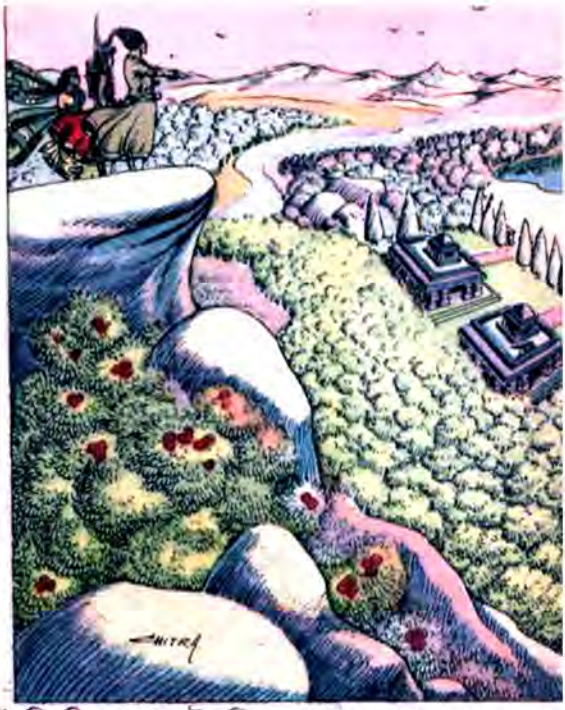

"মণিরঞ্জিত, ওরাই কি তোমার অপহরণ করে আনা পদ্মাবতী ও বসন্তকুমারী?"

"হ্যাঁ, ওরা আপনাদের শৌর্য ও বীরত্ব দেখার জন্য ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।" বলে অন্যদিকে দেখিয়ে মণিরঞ্জিত বলল, "এই যো, ওটাই পাথরের রথ।" দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে সে বলল।

কাছেই একটা কুড়ি ফুট উঁচু পাথরের রথ ছিল। সেই রথের নিচ থেকে পাহাড় উঁচু নিচু ঢেউ খেলিয়ে নিচে নেবে গেছে। খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত ঐ রথের দিকে এগিয়ে যেতেই মণিরঞ্জিত পিছনের দিকে না তাকিয়েই "মণিভূষণ" বলে ডাকল। কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে পিছনের দিকে মুখ

ঘুরিয়ে দেখে সেখানে মণিভূষণ নেই। চারদিক তাকাল কিন্তু তাকে কোথাও দেখতে পেল না।

এভাবে কোন দিন না বলে তার বন্ধু মণিভূষণ কোথাও যায় নি। তাই মণিভূষণকে দেখতে না পেয়ে সে মনে মনে খুব বিরক্ত হল। এই প্রথম এই ধরণের ঘটনা ঘটায় সে অবাক হল। কিছুক্ষণ ভেবেও তার এভাবে চলে যাওয়ার কোন কারণ খুঁজে পেল না মণিভূষণ।

ইতিমধ্যে খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত রথের চারদিকে ঘুরে ঘুরে ভাল করে দেখে নিল। জীবদত্ত নুয়ে রথের নিচের দিকটা দেখিয়ে খড়্গবর্মাকে বলল, "দেখ খড়্গ, নিচের দিকটা ভাল করে তাকিয়ে দেখ। এই রথ পাহাড়, কেটে তৈরি হয় নি। পাহাড়ের উপরকার আলাদা একটা পাথর কেটে এই রথটাকে তৈরি করা হয়েছে। রথের নিচে একটু লক্ষ্য করে দেখ আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। কান খাড়া করে শোন মনে হচ্ছে যেন এর নিচে মানুষ আছে। তাদের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। শুনতে পাচ্ছ?"

জীবদত্তের কথা কানে যেতেই তেলে বেগুনে চটে গিয়ে মণিরঞ্জিত বলল, "তাই নাকি? বাঃ তাহলে তো খুব দেখতে পাচ্ছেন! রথের নিচে আলো আসবে কোত্থেকে? মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যাবে কেন? এখানে মানুষ আসবে কোত্থেকে? যা অসম্ভব তাই বলছেন।"

"অসম্ভব হতে যাবে কেন? পাহাড়ের নিচে থেকে যে সব মানুষগুলো খুঁড়ে খুঁড়ে সোনা মণি-মুক্তোগুলো তুলছে তাদের তুমি ক্রীতদাস বানিয়ে রাখলেও তারা তো মানুষ। ওরা তো নিজেদের মধ্যে কথা-বার্তা বলছে। ওরা তো মূক নয়?" ততোধিক রাগান্বিত স্বরে জীবদত্ত বলল।

মণিরঞ্জিত কিছুক্ষণ ভেবে পেল না কি করবে, কি বলবে। পরে সে বলল, "এসব কথা কে বলেছে? মণিভূষণ বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে তাহলে আমার সঙ্গে?

মণিভূষণ বলেছে ?" রাগে ফেটে পড়ে মণিরঞ্জিত জিজ্ঞেস করল।

"না না, ও বেচারি কিছু বলেনি। ও তোমার চাকর তো বটেই বন্ধুও। সে আমাদের কাছে এমন কোন কথা বলেনি যাতে আমরা এই রথ সম্পর্কে কিছু জানতে পারি আমি আমার দিব্য দৃষ্টিতে এই যক্ষপর্বত ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি।" জীবদত্ত হাসতে হাসতে বলল।

মণিরঞ্জিত ভেতরে ভেতরে রেগে গেলেও বাইরে তা প্রকাশ না করে বলল, "জীবদত্ত কথা বাড়িয়ে তো লাভ নেই ? পাথরের রথ সরানোর কথা, সরানোর চেষ্টা করে দেখতে পার। তোমাদের ক্ষমতা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে পদ্মাবতী ও বসন্তকুমারী দাঁড়িয়ে আছে।"

জীবদত্ত খড়্গবর্মাকে চোখের ইসারা করে বলল, "ঐ যে রাজকুমারীরা দাঁড়িয়ে আছে ঐ অট্টালিকার পাশের অট্টালিকায় তুমি থাক না মণিরঞ্জিত ?"

"হ্যাঁ, ওখানেই আমি থাকি। কিন্তু এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার কারণটা কি ? প্রয়োজনটাই বা কি ?" মণিরঞ্জিত জিজ্ঞেস করল।

"কারণ আছে বই কি। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঐ ভবনটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। আর তুমি তা নিজের চোখেই দেখতে পাবে " বলে জীবদত্ত কিছুক্ষণ মন্ত্র পাঠ করে ঐ মন্ত্রদণ্ড

পাথরের রথের উপর রেখে চাপ দিয়ে রথের গায়ে কষে এক লাথি মারল। মুহূর্তে পাহাড় ফেটে যাওয়ার ভয়ঙ্কর এক প্রচণ্ড শব্দ হলো।

চোখের পলকে ঐ রথ উড়ে গিয়ে মণিরঞ্জিতের অট্টালিকায় আছড়ে পড়ল। পরক্ষণে দেখা গেল ঐ বিরাট অট্টালিকা এবং পাথরের রথ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে ধূলো হয়ে গেল। চোখের পলকে যা ঘটে গেল তা দেখে মণিরঞ্জিত পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখে কথা নেই, চোখে ভাষা নেই। তারপর হঠাৎ সে তার গদা তুলে জীবদত্তকে আক্রমণ করতে গেল।

কিন্তু সে তা পারল না। তার নাকের ডগায় খড়্গবর্মা তরবারি মেলে ধরল।

এই দৃশ্য দেখে আনন্দ আর চাপতে না পেরে জীবদত্ত হো হো করে হেসে গন্ধর্ব বসুমতীর দেওয়া কাঁসার পাত্রটি জোরে বাজাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই যেখানে পাথরের রথ ছিল, তার নিচ থেকে বহু রাক্ষস এবং গন্ধর্বেরা দলে দলে বেরিয়ে এসে আর্তনাদ করতে লাগল। ওরা প্রত্যেকে আরও ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যাবে ভেবে আশঙ্কা প্রকাশ করতে লাগল।

জীবদত্ত ওদের শান্ত হতে বলে ঘোষণা করল, "এখন থেকে আপনারা প্রত্যেকে মুক্ত। যে যেখানে খুশী যেতে পারেন।" তারপর ঐ কাঁসার পাত্রটি উপরের দিকে তুলে বলল, "এই পাত্র আমার দেশের এক গন্ধর্ব, তাঁর নাম বসুমতী, আমাকে দিয়েছেন। আপনাদের মধ্যে যদি কেউ গন্ধর্ব থাকেন তিনি এই পাত্র সানন্দে নিতে পারেন।"

ওদের মধ্য থেকে একজন গন্ধর্ব এগিয়ে এসে ঐ পাত্রটি নিল। তারপর রাক্ষস ও গন্ধর্বদের জীবদত্ত কি যেন গোপনে বলতে যাবে এমন সময় সে "মাগো" বলে চিৎকার শুনতে পেল। সেটা ছিল মণিরঞ্জিতের আর্তনাদ। জীবদত্ত মুখ ঘুরিয়ে দেখল খড়্গবর্মার আঘাতে নিচে

পড়ে গিয়ে মণিরঞ্জিত ছটফট করছে। খড়্গবর্মা তার বুকে পা রেখে গলায় তরবারি ছুঁইয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিল।

সেই দৃশ্য দেখে জীবদত্তের ভীষণ আনন্দ হলো। খড়্গবর্মা জীবদত্তকে বলল, "জীবদত্ত, এই দুরাত্মাকে কি করবো? মেরে ফেলবো না ছেড়ে দেবো? এই পাপীটা পদ্মাবতী ও বসন্তকুমারীকে হরণ করেছে। ওদের আত্মীয় স্বজনদের দুঃখ দিয়েছে। অসংখ্য মানুষ ও রাক্ষসদের ধরে এনে ক্রীতদাস বানিয়েছে। তাড়াতাড়ি বল কি করবো?"

ইতিমধ্যে সেখানে পদ্মাবতী ও বসন্তকুমারী এসে গেল। রক্তচক্ষু করে বসন্তকুমারী মণিরঞ্জিতের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এই নীচ পাপী যক্ষকে যে হত্যা করবে তাকেই আমি বিয়ে করবো। একে বধ করা নিজের চোখে দেখে চোখ জুড়াতে চাই। একে হত্যা না করলে আমাকে সারা জীবন কুমারী জীবন যাপন করতে হবে।"

খড়্গবর্মা অপরূপ সুন্দরী বসন্তকুমারীর রূপে মুগ্ধ হলো। মনে মনে সে ভাবল তাকে স্ত্রী হিসেবে পেতে হলে মণিরঞ্জিতকে হত্যা করতেই হবে। ও তাকে হত্যা করতে যাবে এমন সময় আকাশ থেকে ধ্বনি শোনা গেল "থামুন"! পরক্ষণেই

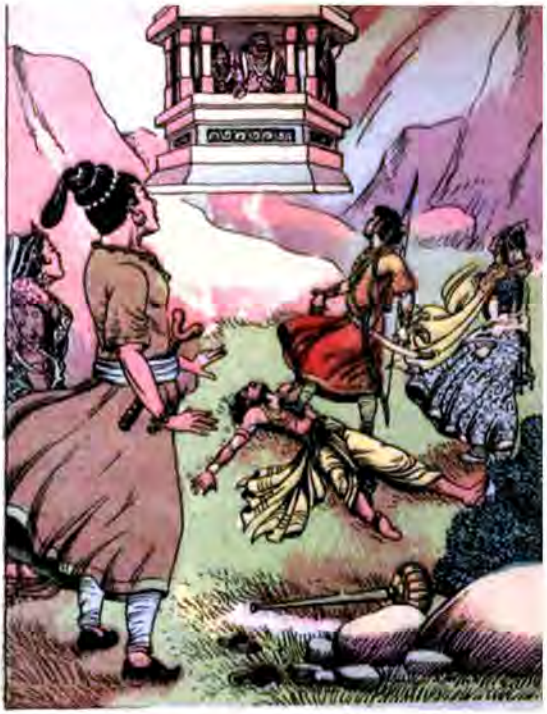

আকাশ থেকে নেমে এলো হংসাকৃতির অপূর্ব সুন্দর একটি বিমান। সেই বিমান থেকে যক্ষরাজ ও মণিভূষণ নেমে এলো। যক্ষরাজ সকলের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, "খড়্গবর্মা, জীবদত্ত, আপনারা যে মহান বীর, সে ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। যে সব ঘটনা এবং দুর্ঘটনা ঘটেছে সে সম্পর্কে আমি বিস্তারিতভাবে মণিভূষণের কাছে শুনেছি।

"মণিরঞ্জিতকে এখন আর মেরে ফেলার আর প্রয়োজন নেই, কারণ সে এখন জীবন্মৃত। যক্ষকুলের এই কুলাঙ্গারের আর কোন ক্ষমতা নেই। একে ছেড়ে দিন।" যক্ষরাজ বলল।

"বীরপুরের রাজকুমারীর প্রতিজ্ঞার কথা কি আপনি জানেন না? তার জীবনের কি হবে?" খড়্গবর্মা বসন্তকুমারীর দিকে একবার তাকিয়ে বলল।

বসন্তকুমারী সলজ্জভাবে পদ্মাবতীর পেছনে দাঁড়াল। যক্ষরাজ হাসিমুখে বলল, "মৃত্যুর চেয়ে জীবন্মৃত থাকা আরও বড় শাস্তি। তাই বসন্তকুমারীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কোন আশঙ্কা নেই। পাথরের রথ সরিয়ে যিনি বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য, জীবদত্তের সঙ্গে পদ্মাবতীর ও মণিরঞ্জিতকে কঠোরতম শাস্তি দেওয়ার জন্য খড়্গবর্মার সঙ্গে বসন্তকুমারীর বিয়ে হবে।"

তৎক্ষণাৎ মণিভূষণ চারটি মালা বিমান থেকে এনে খড়্গবর্মা, জীবদত্ত, পদ্মাবতী ও বসন্তকুমারীর হাতে একটি করে দিল। যক্ষরাজের নেতৃত্বে ওদের মালাবদলের মাধ্যমে বিবাহ অনুষ্ঠান হলো। যারা কিছুক্ষণ আগেও ক্রীতদাস ছিল তারা, সবাই আনন্দে হর্ষধ্বনি করতে লাগল।

যক্ষরাজ, খড়্গবর্মা, জীবদত্ত ও তাদের স্ত্রীদের বিমানে উঠে বসতে বলে সানন্দে বলল, "খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত, এই বিমানে বসে আপনারা যেখানে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করবেন সেখানেই এই বিমান আপনাদের নিয়ে যাবে। আপনাদের যাত্রা শুভ হোক।"

"আপনার এই উপকারের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, যক্ষরাজ।" খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত সানন্দে বলল।

"আর একটি কথা, এই বিমান আপনাদের কাছে এক মাস থাকবে। তারপর আপনা থেকেই বিমানটি আমার কাছে চলে আসবে। বিদায়।" যক্ষরাজ বলল।

সবাই যক্ষরাজকে নমস্কার করল পরক্ষণেই বিমান বায়ুবেগে পদ্মপুর ও বীরপুরের দিকে ধাবিত হলো। (শেষ)

বন্ধু বিচ্ছেদ

বিক্রমাদিত্য প্রতিজ্ঞায় অটল ছিলেন। যা একবার বলেছেন তা কার্যকরী না করে ছাড়ার পাত্র তিনি নন। তাই প্রত্যেক বারের মত এবারও বিক্রমাদিত্য সেই গাছের কাছে গিয়ে গাছ থেকে শব নাবিয়ে কাঁধে ফেলে আগের মত নীরবে পথ চলতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, "রাজা, তুমি হয়ত কোন বন্ধুকে খুশী করার জন্য এত কষ্ট করছ। কিন্তু মনে রেখ কোন্ বন্ধুত্ব যে আজীবন টিকবে তা কেউ বলতে পারে না। তোমাকে এক বন্ধু বিচ্ছেদের কাহিনী বলব। শুনে তোমার পরিশ্রম কমবে।"

বেতাল কাহিনী শুরু করল ঃ

প্রাচীনকালে শঙ্কর ও কেশব নামে দুজন বন্ধু ছিল। ওরা তেমন ধনী ছিল না। ওরা যখন বড় হল তখন তাদের কাঁধে সংসারের

বেতাল কথা

দায়িত্বভার পড়ল। তখন দুজনে ঠিক করল সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে ব্যবসা করবে।

অল্পদিনের মধ্যেই তাদের ব্যবসা বেশ জমে উঠেছিল। ওরা স-ুদ্রে পাড়ি দিয়ে ব্যবসার প্রসার করতে লাগল। শঙ্করের ছিল এক ছেলে আর কেশবের ছিল এক মেয়ে। ওরা দুজনে একসঙ্গে খেলা করত। দুজনে একে অন্যকে ভালবাসত। একে অন্যের খেলার সাথী ছিল। এসব লক্ষ্য করে শঙ্কর তার ছেলের সঙ্গে কেশবের মেয়ের বিয়ে দেবে ঠিক করল। কেশব এই প্রস্তাবে সানন্দে রাজী হল। তারপর ওদের বিয়ের বয়স হওয়ার বিয়ের দিনক্ষণ দেখবে ঠিক করছে এমন সময় সমুদ্রে শঙ্করের মাল বোঝাই জাহাজ ডুবে গেল। শঙ্করের যত জাহাজ ছিল সব ডুবে গেল।

এই খবর শুনে শঙ্কর হতাশায় ভেঙ্গে পড়ল। যারা তার কাছে যত টাকা পেত তারা সব টাকা তার কাছ থেকে চেয়ে নিল। ফলে শঙ্করের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে গেল। তার অবস্থা এত পড়ে গেল যে সেই গ্রামে আর মাথা উঁচু করে চলা তার পক্ষে সম্ভব হল না। শেষে সে একদিন স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে গ্রামের বাইরে চলে গেল।

ওর চলে যাওয়া লক্ষ্য করে কেশব তাকে বলল, "কি হল? কথা ছিল তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে হবে। যাবে যখন ঠিক করেছ আমি বাধা দেব না, তবে ছেলে মেয়ের বিয়ের শুভ কাজটা সেরে গেলেই পারতে।"

"আমার এখন ধান ফেলতে ভাঙ্গা কুলো অবস্থা। আমার মনে হয় সম্পত্তির দিক থেকে তোমার সমকক্ষ পরিবারের ছেলের সঙ্গেই তোমার মেয়ের বিয়ে দেওয়া উচিত।" বলল শঙ্কর।

"তা কেন? তোমার সম্পত্তি জলে ডুবে গেছে তো হয়েছেটা কি? আমার তো আছে! আমরা কি ধনী হিসেবে জন্মেছি। এখন আমাদের ছেলেমেয়েরা ভালভাবে

থাকলে তাতেই আমাদের আনন্দ।" কেশব বলল।

কিন্তু শঙ্কর কোন ক্রমেই এই প্রস্তাবে রাজী হল না। শত অনুরোধ করলেও কোন মতেই শঙ্কর রাজী হল না।

শঙ্কর দক্ষিণ দেশের মাণিক্য নগরে পৌঁছাল। এক রত্ন ব্যবসায়ীর কাছে বাপ আর ছেলে চাকরি নিল। দুজনে ঐকান্তিকতার সঙ্গে তার অধীনে কাজ করতে লাগল। ব্যবসার ক্ষেত্রে থাকার ফলে অল্প দিনের মধ্যেই ভদ্র ব্যবহারের ফলে শঙ্কর ও তার ছেলের পরিচিতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল। কিছুদিন পরে তারা দুজনে নিজেরাই একটা ব্যবসা করতে শুরু করল। তাদের ব্যবসা ভাল জমে উঠল।

শঙ্কর তার সমকক্ষ এক পরিবারের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিল। অল্প কয়েক মাস পরে নাতনীর মুখও দেখল শঙ্কর। নাতনীর নাম রাখল মালতী। মালতীর জন্মের পর শঙ্করের ব্যবসা যেন আরও সমৃদ্ধ হতে লাগল। খুব তাড়াতাড়ি সে আগের মত ধনী হয়ে গেল।

শঙ্করের চলে যাওয়ার পর কেশব নিজের মেয়েকে অন্য এক ব্যবসায়ীর ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিল। ঐ ছেলের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর তাদের এক ছেলে হল। ছেলের নাম রাখল বসন্ত।

বসন্ত বড় হলে একবার বসন্তের বাবা কেশবকে বলল, "শ্বশুর মশাই, আরব দেশে আমাদের এখানকার জিনিসের ভাল

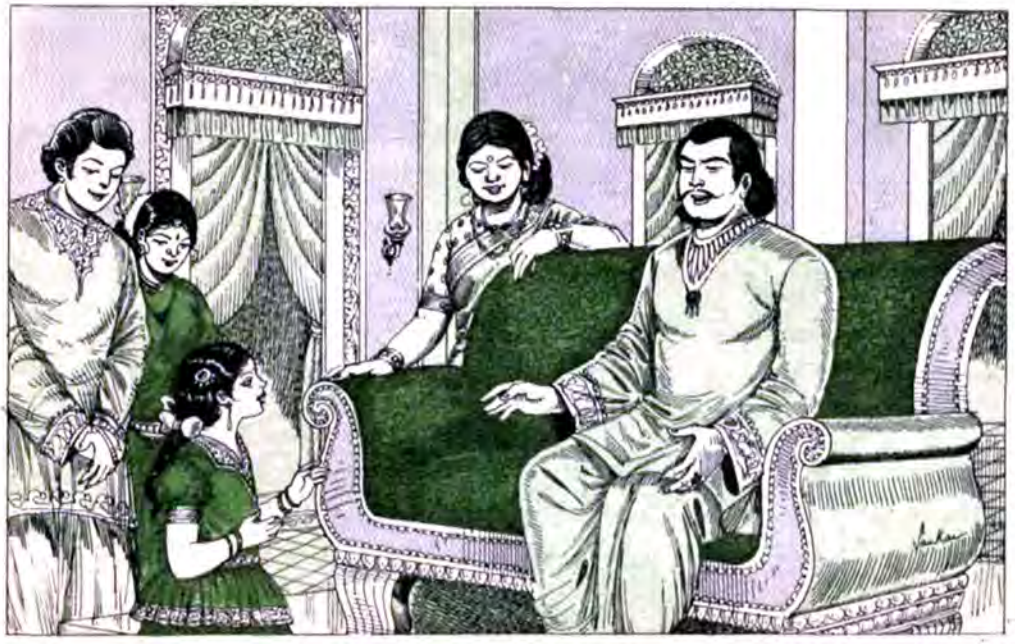

দাম পাওয়া যায় শুনেছি। আর ফেরার সময় আরবের খেজুর ও শিলাজিত আনা যাবে। ওগুলো ওখানে খুব সস্তা, এখানে অনেক দামে বিক্রি করে আমরা কোটিপতি হতে পারব।"

কেশব তাতে রাজী হল। প্রয়োজনীয় উট জোগাড় করে আরবে বিক্রি করার যোগ্য জিনিসপত্র কিনে উটের পিঠে চাপাল কেশব ও বসন্তের বাবা। ওরা দুজনে সপরিবারে রওনা হল আরব দেশের দিকে।

মরুযাত্রা কিছুদিন ধরে ভালই চলল। একদিন গভীর রাত্রে একদল ডাকাত এসে তাদের মেরে উটসহ সমস্ত জিনিস নিয়ে পালিয়ে গেল। কেশবের নাতি বসন্ত ছাড়া বাকি সবাই ডাকাতদের আক্রমণের কবলে পড়ল। প্রত্যেকেই ডাকাতদের ছোরা আর তরবারির আঘাতে মারা গেল। ক্ষুধা আর তৃষ্ণায় ছটফট করতে করতে কোন রকমে বসন্ত মরুভূমির বাইরে এল। বসন্তের ইচ্ছে করল না দেশে ফিরে যেতে। সেখানে তার আপনজন বলতে কেউ নেই। সে আপন খেয়ালে যেখানে যা পেত খেত, যেখানে জায়গা পেত রাত্রে ঘুমোত। যেখানে ইচ্ছে ঘুরে বেড়াত।

বসন্ত কয়েক বছর এইভাবে ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়িয়ে শেষে সে মাণিক্য নগরে পৌঁছাল। সে শঙ্করের দোকানের সামনে এসে, "বাবু, আপনার দোকানের কোন কাজ করতে দেবেন? একটা চাকরী দেবেন বাবু?"

না খেতে পাওয়া ঐ রোগা দুর্বল শরীরের বসন্তকে কাছে ডেকে শঙ্কর লক্ষ্য করল ছেলেটার আদলে কেশবের ছাপ আছে। সে বসন্তকে জিজ্ঞেস করল, "বাবা, তুমি কোত্থেকে এসেছ? তোমার বাবার নাম কি? কি হয়েছে তোমাদের?" অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে শঙ্কর বসন্তকে অনেকক্ষণ ধরে নানা প্রশ্ন করল।

বসন্ত তাদের সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত-ভাবে বলল।

সব কথা শুনে দুঃখে শঙ্কর বিহ্বল হয়ে বলল, "বাবা, তোমার দাদু আমার বন্ধু ছিল। আমাদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। তুমি আমার কাছেই থেকে যাও। তোমাকে ব্যবসা শেখাব।"

বসন্তের কথা শুনে শঙ্কর বুঝতে পারল ছেলেটি বেশ বুদ্ধিমান এবং চালাক চতুর। তার এবং কেশবের পরিবারের মধ্যে যুগ যুগ ধরে যাতে একটা সম্পর্ক থাকে তার জন্য বসন্তের সঙ্গে নিজের নাতনী মালতীর বিয়ে দিল। ওরা দুজনে সুখে শান্তিতে দিন যাপন করতে লাগল।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল, "রাজা, শঙ্করের এ কোন্ বিচিত্র ব্যবহার। সে নিজে যখন নিস্ব ছিল তখন কেশবের মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলের বিয়ে দিল না অথচ কপর্দকহীন বসন্তের সঙ্গে নাতনীর বিয়ে দিল! এ কি ধরণের ব্যাপার? কেশবের মেয়েকে বউমা করে বাড়িতে আনলে কেশবের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের বন্ধন কি আরও দৃঢ় হত না? এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও তুমি সমাধান না দিলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

জবাবে বিক্রমাদিত্য বললেন, "শঙ্কর সব সময় কেশবকে গভীরভাবে ভালবাসত। তবে শঙ্কর ছিল খুব অভিমানী। তাই কেশবের প্রস্তাব তার কাছে মনে হল তার দয়া। বন্ধুত্বের মধ্যে আর্থিক সম্পর্কের কোন স্থান শঙ্করের পছন্দ নয়। এক পর্যায়ে থাকলে কেশবের মেয়েকে সে নিশ্চয় ঘরে বউমা করে আনত। কিন্তু তা হল না। কেশব যখন সব হারাল তখন তার নাতির সঙ্গে নিজের নাতনীর বিয়ে দিয়ে হারানোর বন্ধুত্বের কিছুটা ফিরে পেল শঙ্কর।"

রাজা বিক্রমাদিত্যের এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে আবার সেই গাছে গিয়ে উঠল। (কল্পিত)

বোকা কাহিনী

এক দেশে দুজন বন্ধু ছিল। কথায় কথায় একদিন ওরা নিজেদের চাকরদের বোকামীর ব্যাপারে আলোচনা করল। দুজনের চাকরদের মধ্যে কে যে বেশি বোকা তা পরীক্ষা করে দেখতে ওরা চাকরদের ডেকে পাঠাল।

একজন তার চাকরের হাতে একটি পয়সা দিয়ে বলল, "শোন, তুমি এই এক পয়সা দিয়ে বাইরে থেকে একটা রত্নহার কিনে নিয়ে এসো।" চাকরটা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, "এই যাব আর আসব।" বলে চাকরটা চলে গেল।

দ্বিতীয়জন নিজের চাকরকে বলল, "ওহে শোন, তুমি বাগানে গিয়ে দেখে এসো তো সেখানে আমি আছি কিনা। তাড়াতাড়ি ফিরে এসো, কেমন?"

ওদের বোকামীর কথা ভেবে দুই বন্ধু হাসাহাসি করল। ইতিমধ্যে চাকর দুজন পথে বলাবলি করল তাদের মালিকদের বোকামীর কথা ভেবে। প্রথম চাকর বলল, "আমার মালিক যে কী বোকা তা আর কি বলব। আজ রবিবার বলে কিনা রত্নহার কিনে আন। বলি রবিবারে কি বাইর থাকে?"

আমার মালিক বা কিসে কম যায়? বলে কিনা বাগানে আমি আছি কিনা দেখে এসো। বলি কেন রে বাবা, বাগানের মালির কাছে খোঁজ নিতে পার না।"

কাঠঠোকরা

বহু বছর আগে এক অরণ্যের কাছে দুজন কাঠুরে ছিল। প্রত্যেকদিন ওরা অরণ্যের এক প্রান্তে কাঠ কাটত। একদিন ওরা অনেক ঘোরাঘুরি করেও ওদের মনের মত কাঠ পেল না। শেষে মন খারাপ করে ফিরতে লাগল। তখন হঠাৎ তাদের দুজনের একজনের চোখে একটি ভাল চন্দন গাছ পড়ল।

"দেখ দেখ কি সুন্দর চন্দনগাছ।" বলল প্রথমজন দ্বিতীয়জনকে।

"দেখেছি, দেখেছি। এগাছ আমি ভোর রাত্রে স্বপ্নে।" বলল দ্বিতীয়জন অন্য মতলবে।

"স্বপ্নে দেখলে কি হবে?" বলে প্রথম জন। আরও বলল, "ভগবান আমাকে এদিকে হাঁটালেন, চোখ ওদিকে ঘোরালেন তবেইতো আমি দেখতে পেলাম।" দ্বিতীয় জন বলল, "না, আমি প্রথম এদিকে হাঁটতে শুরু করলাম, তুমি আমার পিছনে পিছনে আসছিলে। অতএব এই গাছটা আমার।"

"হাঁটলে কি হবে, দেখাটাই আসল। আমি না দেখতে পেলে আমরা সোজা চলে যেতাম। যাই হোক, ন্যায় বিচারে এটা আমার হলেও যেহেতু তুমি আমার সঙ্গে আছ সেহেতু আমি চাই গাছটার আমাদের মধ্যে সমান ভাগ হোক। সেটা দুজনের পক্ষেই ভাল হবে।" বলল প্রথমজন।

একথা শুনে খুশী হওয়ার পরিবর্তে দ্বিতীয়জন আরও রেগে গিয়ে বলল, "কী তুমি ভগবানের দেওয়া স্বপ্নকে মিথ্যা বলছ? ভগবান যে গাছ স্বপ্নে দেখালেন তা মিথ্যা? গাছটা আমার নজরে না পড়লেও ভগবান আমাকে ঠিক গাছের কাছে টেনে নিয়ে

সুন্দর সেনগুপ্ত

যেতেন। যাই হোক, দেখেছ যখন তোমাকে না হয় আমি দুটো ডাল দিতে পারি, তার বেশি নয়। এতে যদি খুশী না হও তাহলে আমি ভগবানের নির্দেশে তোমার মাথা ফাটিয়ে দেব।"

প্রথমজন খুব ধর্মভীরু লোক। দ্বিতীয়-জনের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করে বলল, "ঠিক আছে তোমার যা ইচ্ছে তাই কর।" পরে দ্বিতীয়জনের দেওয়া দুটো ডাল নিয়ে চলে গেল। বাকি অংশটা নিয়ে প্রথমজন গেল নিজের ঘরে।

প্রথমজন যা ঘটে গেল তা ভাবতে ভাবতে পথ ভুলে আরও গভীর অরণ্যে চলে গেল। সেখানে গভীর রাত্রে সে একটা গাছে উঠে বসল। কিছুক্ষণ পরে শুনতে পেল কে যেন "জল জল" বলে আর্তনাদ করছে। সে চারদিক তাকিয়ে দেখল। জ্যোৎস্না রাত হওয়ায় সে দেখতে পেল দূরে একটি কুঁড়ে ঘর রয়েছে। গেল সেখানে। ঘরে ঢুকে দেখল একটি বুড়ি জল চাইছে। কলসী থেকে জল এনে বুড়িকে সে জল খাওয়াল।

বুড়ি জল খেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে অতি কষ্টে বলল, "বাবা, তুমি আমার খুব উপকার করলে। আমি আর বেশিক্ষণ বাঁচব না। আমার মারা যাওয়ার পর এই দেহটা চন্দন কাঠে পোড়ালে আমার আত্মা শান্তি পাবে।"

সে বলল, "মাগো, আমি খুব গরিব লোক। আমার কাছে শুধু দুটো চন্দন

কাঠ আছে সেই দুটো আমি তোমার চিতের উপর রাখব।"

"বাবা, তাতেই চলবে। আর শোন। তুমি খুব ভাল ছেলে। আমার খুব উপকার করলে। একটা কথা মনে রেখ। আমি মরে গেলে আমার বিছানার নিচে মাটি খুঁড়লে তুমি অনেক টাকা পাবে। সেই টাকার দশ ভাগের এক ভাগ তুমি খরচ করবে বাকি ন ভাগ গরিবদের মধ্যে ভাগ করে দেবে। আমার কথামত চললে তুমি একদিন স্বর্গে যেতে পারবে।" বুড়ি বলল।

দ্বিতীয়জন অতবড় চন্দন গাছ বিক্রি করে অনেক টাকা করে বাড়ি কিনে বাগান কিনে বেশ আরামেই দিন কাটাতে লাগল। সে প্রথমজনের সঙ্গে আলাপ করা বা কথা বলাই ছেড়ে দিল।

হঠাৎ হাতে টাকা পয়সা পড়লে অনেকেরই অহঙ্কার হয়। আর এই অহঙ্কারের ফলে তারা নিজেদের চাল চলন আচার আচরণ বদলে নেয়। দ্বিতীয়জনেরও তাই ঘটেছিল।

প্রথমজন বুড়ির কাছে পাওয়া টাকার দশ ভাগের ন ভাগ গরিবদের মধ্যে বণ্টন করে বাকি এক ভাগ দিয়ে নিজের ঘরবাড়ি একটু সারিয়ে বাদবাকি যা ছিল তা জমিয়ে রেখে দিল।

সে যে সৎ তা ক্রমশ সবাই জানতে পেরে বহু লোক তার কাছে সুখ দুঃখের কথা বলতে আসত।

এত লোককে প্রথমজনের কাছে আসতে দেখে দ্বিতীয়জনের ভাল লাগল না। সে তার বউকে বলল, "কিভাবে যে ওকে জব্দ করব ভেবে পাচ্ছি না। তুমি একটা বুদ্ধি দাও তো।"

ও বোধহয় কোত্থেকে কিছু পেয়েছে। নাহলে গরিবদের অত দান করে কি করে। ঐ পাওয়া টাকা থেকেই প্রত্যেকদিন কিছু কিছু খরচ করে।" দ্বিতীয়জনের বউ বলল।

একদিন সে প্রথমজনের পিছনে বনে গেল। তার ধারণা অন্য কোন জায়গা থেকে সে প্রত্যেকদিন কিছু কিছু আনে। আজ ঠিক রহস্যের সন্ধান পাবে।

অনেকক্ষণ অনুসরণ করে কিছুতেই যখন ধরতে পারল না তখন সে সোজা প্রথম-জনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় আছে ঐ ধন-সম্পত্তি বল।"

"কিসের সম্পত্তি?" প্রথমজন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল।

ওর আশ্চর্য হওয়াতে দ্বিতীয়জনের সন্দেহ আরও গভীর হল। সে ভাবল যে গাছের নিচে প্রথমজন অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে সেখানেই হয়ত মাটির নিচে সম্পত্তি আছে। সম্পত্তির লোভ একবার মনে ঢুকলে তা বাড়তে থাকে। শান্ত মনে ঢেউ ওঠে। ক্রোধ ও ঈর্ষা জাগে অন্যের বিরুদ্ধে। ঈর্ষা ও দ্বেষের ফলে মানুষের চরিত্রের দ্রুত অবনতি ঘটে। লজ্জা ঘৃণা ভয় থাকে না। একথা ভেবে সে তার হাতের কুড়ুল কেড়ে নিয়ে প্রথমজনের মাথা ফাটিয়ে দিল। গলগল করে রক্ত ঝরতে লাগল। "সারা জীবন খুঁজলেও তুমি সেই সম্পত্তি খুঁজে পাবে না।" বলতে বলতে প্রথমজন সেখানেই মারা গেল।

পরক্ষণেই দ্বিতীয়জন কাঠঠোকরা হয়ে গেল। তার পর থেকে কাঠঠোকরা গাছে ঠোকর মারতে মারতে সেই সম্পত্তির খোঁজ করে। আজও করছে।

বুদ্ধির প্রশংসা

এক রাজা একদিন রাত্রে বিচিত্র এক স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্ন দেখার পর রাজার ঘুম ভেঙ্গে গেল। রাজা ঠিক করলেন সকালে ঐ স্বপ্নের কথা সবাইকে জানাবেন। কিন্তু সকালে স্বপ্নে যে কি দেখেছিলেন তা ভুলে গেলেন।

রাজা হতাশ হলেন। নগরের সমস্ত জ্যোতিষীকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "কাল রাত্রে আমি এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু সকালে তা ভুলে গেছি। আমি যে স্বপ্ন দেখেছি তা বলতে পারলে আমি প্রচুর ধন উপহার দেব।"

একথা শুনে জ্যোতিষীদের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তারা বলল, "মহারাজ, জ্যোতিষ বিদ্যায় এমন কোন সূত্র নেই যাতে স্বপ্নের বিষয় ধরা যায়।"

কিন্তু ওদের মধ্যে একজন জ্যোতিষী বলল, "মহারাজ, আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারলে আমি আপনার স্বপ্নের কথা বলতে পারি।"

"কি প্রশ্ন তোমার কর।" রাজা বললেন।

"আপনি আমাকে যে অর্থ উপহার দেবেন আমি তা কিভাবে খরচ করব বলুন তো?" ঐ জ্যোতিষী বলল।

"তা আমি কি করে বলতে পারব।" রাজা বললেন।

"জেগে থাকা মানুষ কি ভাবছে তাই যখন বলতে পারছেন না মহারাজ তখন ঘুমন্ত মানুষের স্বপ্নের বিষয় কি করে বলা যায় বলুন মহারাজ?" বলল সেই জ্যোতিষী। রাজা তার প্রশ্নে খুশী হয়ে তাকে উপহার দিয়ে বিদায় দিলেন।

রাজার শ্যালক

কোন এক সময় মহাসেন নামে এক রাজা সমগ্র ভারত জয় করে চক্রবর্তী উপাধি লাভ করেছিলেন। যে সমস্ত ছোট ছোট রাজাদের পরাজিত করেছিলেন, পরে তাদের সেই সেই অঞ্চল দেখাশোনার ভার দিয়ে তাদের কাছ থেকে কর আদায় করতেন।

রাজ্য বিস্তারের জন্য, রাজ্য জয়ের জন্য শত্রু পক্ষের অনেক মানুষকে হত্যা করলেও যুদ্ধের পরে কিন্তু প্রজাদের প্রতি রাজা খুব দয়ালু ছিলেন। ওদের সুখ সুবিধার দিকে নজর রাখতেন। বহু পরিকল্পনা করে দেশের মানুষের যাতে মঙ্গল হয় তার ব্যবস্থা করেছিলেন। দেশের নানা প্রান্ত থেকেই সুখবর পেতেন কিন্তু শুধু কোশল দেশ থেকে তেমন খবর পেতেন না। নানাভাবে চেষ্টা করেও কোশল দেশের মানুষের সুখ সুবিধার সঠিক খবর কিছুতেই সংগ্রহ করতে পারতেন না। রাজার পরিকল্পনাগুলো কোশল দেশেও ঠিকমত কার্যকরী হচ্ছে কিনা তাও তাঁর অজানা থাকত।

রাজা মহাসেনের এক রাজপুরোহিত ছিল। তার গুণনিধি নামে এক বন্ধু ছিল। গুণনিধির আচার আচরণে কথাবার্তায় অনেকে আনন্দ পেত। রাজার মন যখন খারাপ থাকত, তখন তিনি গুণনিধিকে ডেকে পাঠাতেন। তার কথা শুনে আনন্দ পেয়ে রাজার মন হাল্কা হত।

গুণনিধির ধর্মের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল। তার একমাত্র বাসনা ছিল সারা ভারতের মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে দেবদর্শন করা। পুণ্য অর্জন করা।

কিছু কিছু জায়গায় ঘুরে এলেও আরও কিছু স্থানের মন্দিরে ঘোরা বাকি ছিল।

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

গুণনিধি শুনেছিল কোশল দেশে প্রতিটি পাড়ায় মন্দির আছে এবং প্রতিটি ঠাকুর জাগ্রত। শেষে কোশল দেশে যাওয়ার জন্য গুণনিধি রওনা হল।

গুণনিধির যাত্রা যাতে সুখের হয় সেজন্য রাজপুরোহিত সারথি সহ একটি রথ পাইয়ে দিল। কোশল দেশে ঢুকে গুণনিধি প্রথমে রামপুর গ্রামে গেল। সেখানে ছিল এক নটরাজ মন্দির। মন্দিরটি দেখতে খুব সুন্দর ছিল। মন্দিরের ভিতর ঢুকতে ঢুকতে গুণনিধি জোরে জোরে বলল, "হর হর মহাদেব।"

পরক্ষণেই দুজন প্রহরী এসে গুণনিধিকে ধরে নিয়ে গেল। গুণনিধি কোন কারণ বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে? তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

"জাননা, মন্দিরে শব্দ করা নিষেধ?" প্রহরীরা বলল।

"আরে ভাই, আমি এখানকার নিয়ম কানুন জানি না। অজান্তে একটা ভুল করে ফেলেছি। ছেড়ে দাও।" গুণনিধি তাদের বলল।

কিন্তু প্রহরীরা কোন কথা না শোনায় গুণনিধি গ্রাম প্রধানের কাছে যাওয়াই ঠিক করল।

নবাগতের পক্ষে একটি দেশের নিয়ম-কানুন জানা সম্ভব নয়। এক এক দেশ

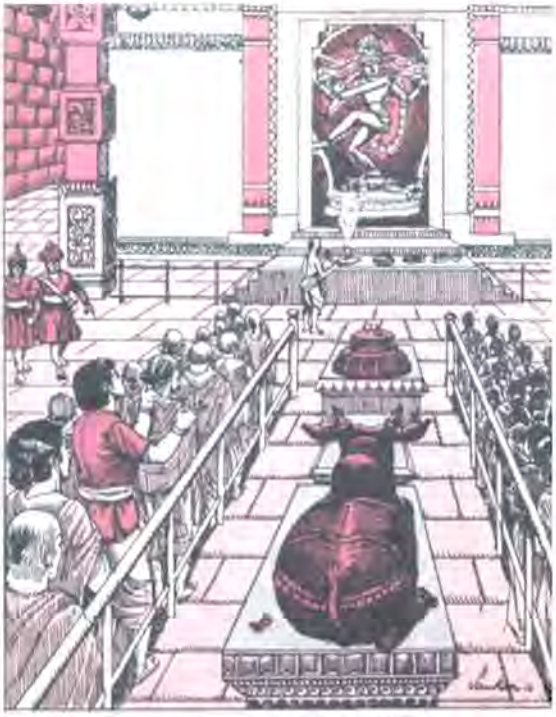

এক এক রকমের। কোথাও আইন ভঙ্গ হচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য রাখার লোক থাকে। আবার কোথাও থাকে না। এক দেশে যা অপরাধ, অন্য দেশে তা নয়।

মন্দিরের ঘটনা থেকে সব কিছু লক্ষ্য করছিল এক যুবক। সে গুণনিধির কাছে এসে আস্তে আস্তে বলল, "কেন মশাই মিছিমিছি বিপদে পড়তে যাচ্ছেন? এই প্রহরীদের হাতে কিছু কিছু দিয়ে দিন সব ঠিক হয়ে যাবে।"

গুণনিধি তার উপদেশ মত প্রহরীদের হাতে রূপোর মুদ্রা দিয়ে মুক্তি পেল।

তারপর গুণনিধি সেই যুবককে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা মশাই এ আপনাদের দেশে

কি রকম নিয়ম ? মন্দিরে ঠাকুরের নাম নেব সেটাও বে-আইনী ?"

যুবক হাসতে হাসতে বলল, "মশাই, এদেশে আইন টাইন বলে কিছু নেই। কখন যে কোনটা বে-আইনী কাজ হয়ে যাবে তা আমরা যে এই দেশের মানুষ আমরাই জানি না। আপনি তো বিদেশী। আমরা যা জানি তা হলো প্রহরীরা যখন বে-আইনী বলবে তখন তাদের হাতে কিছু দিতে হয়। সব সময় আইন কানুন বই পড়ে বোঝা যায় না। আইন কিভাবে রক্ষা করা হয় তা দেখে বুঝতে হয়। আমরা প্রত্যেকদিন দেখে দেখে যা বুঝেছি তাই বলছি। আমার কথা বিশ্বাস না হয় আপনি যা ইচ্ছে করতে পারেন। আপনাকে আমি বাধা দেব না। আপনাকে নিষেধ করার কারণ ওরা যদি গ্রাম প্রধানের কাছে নিয়ে যায়, তখন গ্রাম প্রধানকে অনেক বেশি দিতে হয়।"

একথা শুনে গুণনিধি অবাক হয়ে বলল, "কি বলছেন মশাই, গ্রাম প্রধানও ঘুষ খায় ? এসব খবর রাজাকে জানানো হয় না ?"

"কে জানাবে ? কার এতবড় বুকের পাটা আছে ? জানেন না, আমাদের গ্রাম প্রধান রাজার শ্যালক ?" যুবক বলল।

গুণনিধি যুবককে জানাল যে সে রাজপুরোহিতের বন্ধু। তখন যুবক বলল, "একথা আপনি গ্রাম প্রধানকে জানালে আপনাকে আর কোন কাজে কেউ বাধা দেবে না।"

গুণনিধি গ্রাম প্রধানের কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিল। এরপর কোশল দেশের একটার পর একটা গ্রামে ঘুরে নিজেকে রাজপুরোহিতের বন্ধু হিসেবে পরিচয় দিয়ে খুব ভালভাবেই তীর্থযাত্রা সেরে ফিরতে পারল।

রামপুরের মত প্রত্যেকটি গ্রামের গ্রাম প্রধানরা ও প্রহরীরা ঘুষ খেত। এ খবর গুণনিধি কোশল দেশের বিভিন্ন গ্রামের মানুষকে প্রশ্ন করে জানতে পারল। গুণনিধি খুব ভালভাবেই বুঝতে পারল যে

গ্রাম প্রধানরা নিজেদের মিথ্যে পরিচয় দিয়ে ঘুষ খায় এবং প্রজাদের শোষণ করে। শ্যালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে পাছে রাজা রাগ করেন এই ভয়ে কেউ কোন অভিযোগ করার সাহস পেত না।

গুণনিধির ফেরার খবর রাজপুরোহিতের কাছে শুনে রাজা মহাসেন তাকে ডেকে পাঠালেন। ভ্রমণ বৃত্তান্ত জানিয়ে গুণনিধি রাজাকে জিজ্ঞাসা করল, মহারাজ, অনুগ্রহ করে আপনি কি আমাকে জানাবেন যে কোশল দেশের রাজার কতজন শ্যালক আছে?"

রাজা হাসতে হাসতে বললেন, "কেন গোনা হয়নি? তাহলে আর কিসের তীর্থ-যাত্রা হল?"

"কি করে গুণব মহারাজ? প্রত্যেক গ্রাম প্রধানই কোশল রাজার শ্যালক? তাহলে কোশল দেশে যত গ্রাম আছে, শ্যালকের সংখ্যা তত। এখন আপনি জানেন কোশল দেশে কটা গ্রাম আছে?"

রাজা যতই হেসে প্রশ্ন করুক না কেন মনে মনে তাঁর কোশল দেশের ব্যাপারে খুব দুশ্চিন্তা হল। কারণ তিনি জানেন কোশল রাজার স্ত্রী দুজন। শ্যালকের সংখ্যা যতই হোক অত হাজার শ্যালক হতেই পারে না। তার মধ্যে কোশল রাজার প্রথম স্ত্রী, বড় রাণী রাজা মহাসেনের

বোন। দ্বিতীয় স্ত্রীর ভাই তাহলে কত হাজার!

গুণনিধিকে বিদায় দিয়ে রাজা গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। উনি ভাবলেন এত দিন যে কোশল দেশে তাঁর পরিকল্পনা মত কাজ হচ্ছে কিনা এজন্যই তিনি জানতে পারেন নি।

অনেক ভেবে রাজা মহাসেন ঠিক করলেন তিনি নিজে কোশল দেশে যাবেন। নিজের চোখে সেখানকার অবস্থা দেখবেন। নিজের কানে সেখানকার লোকের কথা শুনবেন।

রাজা মহাসেন ছদ্মবেশে ঘুরে ঘুরে দেখলেন, প্রজাদের কাছ থেকে প্রহরীরা যখন

তখন আজেবাজে অজুহাতে ঘুষ খাচ্ছে। আর যেসব লোককে ওরা গ্রাম প্রধানের কাছে নিয়ে যাচ্ছে গ্রাম প্রধান প্রহরীদের চারগুণ বেশি ঘুষ খাচ্ছে। দেশের পথে-ঘাটে আবর্জনা স্তূপিকৃত হয়ে রয়েছে। সারা দেশে জোর যার মুলুক তার অবস্থা। রাহাজানি গুণ্ডামি চরমে উঠেছে। মহিলারা রাত্রে তো দূরের কথা দিনের বেলায়ও বেরুতে ভয় পায়। রাজা মহাসেন ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

রাজা এতদিন যা ভাবতেন তার সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নেই। তিনি যেভাবে দেশ গড়ার কথা ভাবছিলেন, যেভাবে পরিকল্পনা করছিলেন তার সঙ্গে মাটির কোন সম্পর্ক নেই। এত বড় দেশের প্রত্যেক প্রান্তে নিজে গিয়ে দেখতে পারেন না। নির্ভর করতে হয় অনুচরদের উপর। তাহলে কি অনুচররা তাঁকে এতদিন মিথ্যে কথা বলে আসছে।

এইসব দেখে শুনে রাজা মহাসেন বুঝতে পারলেন, কোশল দেশে শাসন নামক কোন বস্তু নেই। উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা কার্যকরী হচ্ছে না। অপচ পরিকল্পনা খাতে যত টাকা খরচ হওয়ার কথা তার চেয়ে বেশি খরচ হয়ে যাচ্ছে।

মহাসেন তৎক্ষণাৎ কোশল দেশের সমস্ত গ্রাম প্রধানদের পদ তুলে দিলেন। তাদের পরিবর্তে মহাসেন অন্য লোক দিয়ে ভিন্ন পদ্ধতিতে দেশের পরিচালনা করার ব্যবস্থা করলেন।

এই ব্যবস্থা করার বহুদিন পরে রাজা কোশল দেশের বিভিন্ন গ্রামবাসীকে জিজ্ঞাসা করলে ছদ্মবেশি রাজাকে চিনতে না পেরে গ্রামবাসীরা সহজভাবে বলতো, "এখন তো আর রাজার শ্যালক গ্রামের মাথা নয়, তাই আমরা খুব ভাল আছি।"

প্রজাদের এই কথা শুনে রাজা মহাসেন খুব শান্তি পেলেন।

হরিনাথের পরিবর্তন

মেঘনা নদীর তীরে সুরূপা নামে এক সুন্দর গ্রাম ছিল। ঐ নদীর তীরের অঞ্চল ধনে-ধান্যে-পুষ্পে ভরা ছিল। গ্রামের মানুষ সারা বছর পরিশ্রম করে প্রচুর ফসল ফলাত।

গ্রাম প্রধানের নাম ছিল দীননাথ। বয়স তার ষাট। খুব বুদ্ধিমান। সৎ। এবং স্বার্থপর নয়। কোন কাজ নিজের আখের গুছোনোর জন্য করত না। সব গ্রামের মঙ্গলের জন্যই করত। তাই গ্রামের সবাই তাকে ভালবাসত। শ্রদ্ধা করত। গ্রামের এবং গ্রামের আশেপাশের লোক এক ডাকে তাকে চিনত।

অনেক বছর পর্যন্ত দীননাথের কোন ছেলেমেয়ে হল না। হয় না—হয় না—শেষে পঞ্চাশ বছর বয়সে তার একটি ছেলে হল। ছেলের নাম রাখল হরিনাথ।

হরিনাথের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বুদ্ধি শুদ্ধিও বাড়তে লাগল। লেখাপড়ায় খুব ভাল হয়ে উঠতে লাগল। ছ'বছর বয়সে তাকে দীননাথ গ্রামের পাঠশালায় পাঠাল। প্রথম শ্রেণী থেকেই সে প্রথম হতে থাকল। দু-একবার যা শুনত তাই মনে রাখতে পারত। তার স্মরণ শক্তি এত ভাল ছিল যে শুনে শুনেই তার মুখস্থ হয়ে যেত, বই খোলার আর প্রয়োজন হত না। তার স্মৃতি শক্তির ক্ষমতা দেখে অনেকেই অবাক হয়ে যেত। বহু লোক খুশীও হত।

পাশাপাশি হরিনাথের দুষ্টবুদ্ধিও কম ছিল না দুষ্টুমী করে সে ভীষণ আনন্দ পেত। যার তার আমবাগানে ঢুকে পড়ত। আম পেড়ে বিলোত। গাছের ডালপালাও ভাঙত। সুযোগ বুঝে গোয়ালঘরের দরজা খুলে গরুদের ছেড়ে দিত। বাঁধা গরু ছাড়া

এ. সি. সরকার (জাদুকর)

পেয়ে ছুটে পালাত। ফলে যাদের গরু তারা হয়রান হয়ে গরু খুঁজে বেড়াত। হরিনাথের জ্বালায় গ্রামের গাছে পাখী বসতে পারত না। গুল্‌তি দিয়ে সে বহু পাখী মেরে ফেলেছিল। বহু পাখীর নীড় ভেঙে নষ্ট করে দিয়েছিল।

আগে গ্রামের দীঘির পাড়ে হলুদ রঙের বহু পাখী সারাদিন কিচির মিচির করত। মনের আনন্দে ঘোরাঘুরি করত। কিন্তু হরিনাথকে দেখলেই ওরা ঝাঁকে ঝাঁকে পালাত। ওই হলুদ রঙের পাখী ধরে যারা বিক্রি করে সংসার চালাত তাদের মহা বিপদে পড়তে হয়েছিল। তাদের রোজ-গারের পথ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

শুধু তাই নয় অতগুলো নানা রঙের পাখী থাকাতে গ্রামের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পেত। কিন্তু হরিনাথে জ্বালায় গ্রামে পাখী রইল না। গ্রামের মনোরম শোভা, মধুর কলরব লুপ্ত হল।

একদিন হরিনাথ পাখীর নাড় ভাঙার জন্য এক উঁচু তালগাছে উঠল। অত উঁচু তাল গাছে উঠে পাখীর বাসায় তালপাতা সরিয়ে হাত দিতে না দিতেই ফোঁস্ করে একটা আওয়াজ হল। পরক্ষণেই বিরাট এক সাপ নীড় থেকে মাথা তুলে হরিনাথকে ছোবল মারল। সঙ্গে সঙ্গে সাপের বিষ হরিনাথের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল। সে অজ্ঞান হয়ে অত উঁচু গাছ থেকে মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু নীচে খুব কাদা থাকায় তার হাড়গোড় তত ভেঙ্গে যায়নি। তবে পায়ের একটি হাড় ভেঙে গিয়েছিল। গ্রামের ওঝা তৎ-ক্ষণাৎ ভীষণ চেষ্টা করে বিষ নাবাল। এই ঘটনার বহুদিন পরে হরিনাথের পায়ের হাড়ে জোড়া লেগেছিল।

হরিনাথের গাছ থেকে পড়ার দীননাথ অনেক চেষ্টা করেছিল ছেলের দুষ্টুমী কমাবার জন্য। গালাগাল দিল, মারল, খেতে দিল না—কিন্তু এত করেও কিছুতেই হরিনাথ শোধরাল না। গাছ থেকে পড়ার পর হরিনাথ ভেবেছিল ছেলে এবার শুধরে যাবে। কিন্তু কার্যত তা হল না। হরি-

নাথের সব দুষ্টুমী লোপ পেলেও তার গাছ থেকে পাখীর নীড় ভাঙার অভ্যেসটি গেল না।

একদিন হরিনাথের জ্যাঠামশাই তাদের বাড়িতে এসে তাকে বলল, "হ্যাঁরে, তুই এত নিষ্ঠুর হয়ে গেছিস কেন? পাখীদের ডিম নষ্ট করিস, বাচ্চা মেরে ফেলিস—ওরা কষ্ট পায় না? ওরা তো তোকে অভিশাপ দেয়।" বলল হরিনাথের জ্যাঠামশাই সোমনাথ।

"না, জ্যাঠামশাই, আমি তো ডিম নষ্ট করি না? ডিম নিয়ে শুধু খেলি।"

"ওতো একই কথা হলো। ডিমেই তো প্রাণ থাকে। তাকি তুই জানিস না!" বলল সোমনাথ।

"তা" কেন হবে। ওই গোল গোল জিনিসে কি আর প্রাণ থাকে? ওগুলো নিয়ে তো পাখীরা খেলা করে। আমরা তো হাঁস-মুরগীর ডিম খাই—তাতে প্রাণ থাকে না? খেতে পারি—খেলতে পারি না? কোনটাতেই প্রাণ থাকে না। হরিনাথ বলল।

"ওরে নারে পাগলা! ওতে প্রাণ থাকে।" সোমনাথ বলল।

"না থাকে না। প্রাণ থাকলে নড়ত, শব্দ হত। আমরা যে গুলি চুম্নি খেলি তাতে যেমন প্রাণ থাকে না পাখীর ডিমেও তেমনি প্রাণ থাকে না।" হরিনাথ বলল।

"ঠিক আছে আমি যদি তোকে প্রমাণ করে দিতে পারি যে পাখীর ডিমে প্রাণ থাকে তাহলে তুই এই ডিম নিয়ে খেলা

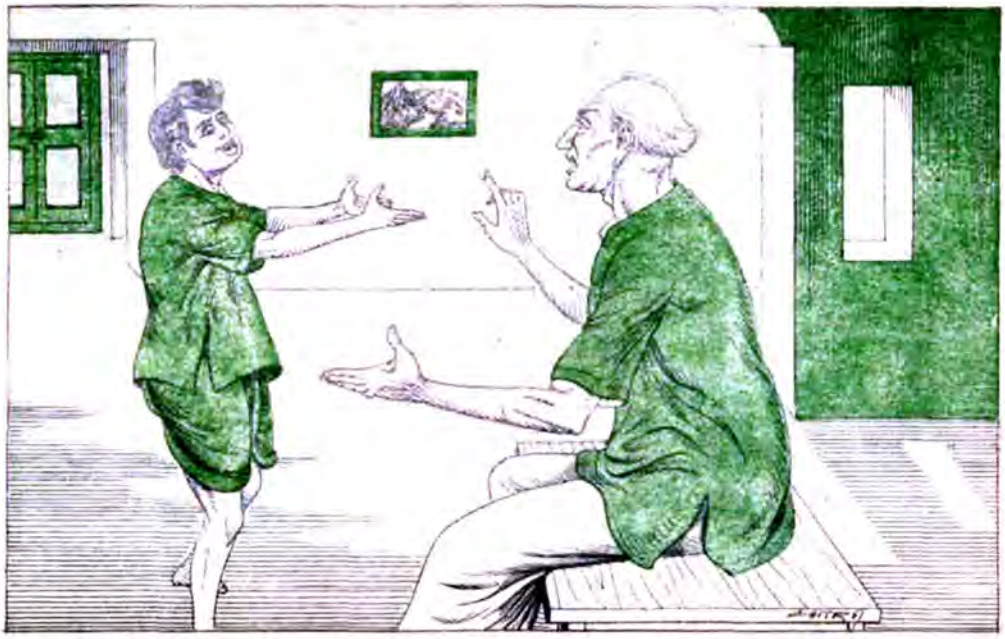

ছাড়বি তো ? আমাকে কথা দিতে হবে।" সোমনাথ বলল।

"ঠিক আছে প্রমাণ কর। ছেড়ে দেব।" হরিনাথ বলল।

"আজ বিকেলেই আমি প্রমাণ করে দেব। তবে কাল থেকে কিন্তু তোমার আর এসব দুষ্টুমী করা চলবে না। কথা দিচ্ছ তো ?" সোমনাথ বলল।

"ঠিক আছে। কথা দিলাম।" হরিনাথ বলল।

যে সোমনাথ জাদু জানে তার পক্ষে ডিম নড়ানো এমন কিছুই নয়। ওই হলুদ পাখীর একটি ডিম জোগাড় করে তাতে একটা ছোট্ট ফুটো করে ভেতরের সমস্ত পদার্থ বের করে দিল। ভাল করে ডিমের ভেতরটা ধুয়ে খোলটা শুকিয়ে নিল। তারপর ঐ খোলসের ভেতরে একটি পোকা ঢুকিয়ে, তার যাতে দম বন্ধ হয়ে না যায় তার জন্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ছিদ্র রেখে ডিমের ফুটোটি বন্ধ করে দিল। তারপর বিকেলে হরিনাথকে ডেকে সোমনাথ ওই পোকা-ভরা ডিমটি তার সামনে টেবিলের ওপরে রাখল। কিছুক্ষণ পরেই ডিম গড়াতে লাগল।

"দেখলে তো ! ডিমে প্রাণ না থাকলে কি আর নড়ে ?" সোমনাথ বলল।

চোখের সামনে যা দেখছিল হরিনাথ তা' অস্বীকার করবে কি করে ! টেবিবের উপরে ডিমটাকে গড়াতে দেখে হরিনাথ অবাক হয়ে ভাবছিল। তার মন বেদনায় ভরে গেল। মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করল একাজ আর কোনদিন সে করবে না। তারপর থেকে হরিনাথ একেবারে বদলে গেল। আর কোনদিন নীড় ভেঙে ডিম পেড়ে খেলা করল না। গ্রামের সবাই খুব খুশী হল। পরবর্তীকালে হরিনাথ লেখা-পড়ায় অনেক ভাল হয়ে গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করল।

বাচাল

ঘুরতে ঘুরতে শেষে এক অরণ্যে পৌঁছে গেল পাঁচজন যাত্রী। ওদের একজন জন্মান্ধ। আর একজন কালা। তৃতীয়জনের দুটো পা-ই। চতুর্থের দুটো হাত নেই। পঞ্চমজন অত্যন্ত দরিদ্র। হঠাৎ যে কানে শুনতে পায় না সে কিছু শোনার মত বলল, "মনে হচ্ছে যেন দূর থেকে কতগুলো ঘোড়া ছুটে আসছে। হয়ত ডাকাতের দল আসছে।"

সঙ্গে সঙ্গে অন্ধটি বলল, "ঐ তো আকাশে ঘোড়ার খুরের ধূলো উড়ছে।"

যার পা নেই সে ঐ অন্ধের কাঁধে বসেছিল। সে বলল, "তাহলে আর এখানে নিরাপদ নয়। চল, ছোটা যাক।"

"সে কি পালাব? না। আমরা ডাকাতদের মোকাবিলা করব।" যার হাত নেই সে বলল।

এসব কথা শুনে যে লোকটা নিঃস্ব এবং দরিদ্র, সে বলল, "তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাজা উজীর মারো আর ওদিক ডাকাতরা এসে গিয়ে আমার সব লুটে পুটে নিয়ে যাক।"

ধরা পড়ল

গোপালপুরমে শিবশর্মা নামে এক যুবক ছিল। ওর বাবা-মা কেউ ছিল না। ঠাকুরদার আমলের একটা মুক্তো ছিল তার কাছে। সে ওই মুক্তো বন্ধক রাখল মঙ্গল শেঠের কাছে।

ওই টাকা দিয়ে সে এক শহর থেকে জিনিস কিনে অন্য শহরে বিক্রি করতে লাগল।

মঙ্গল শেঠ মুক্তো চিনত। সে শিবশর্মার মুক্তোটি পরীক্ষা করে বুঝল যে তার দাম অনেক। সেই মুক্তোটি সিন্দুকে না রেখে সাবধানে রাখার জন্য বউকে দিল।

মঙ্গল শেঠের বউ অত ভাল দামী মুক্তো চোখ বড় বড় করে তা দেখে স্বামীকে নানা প্রশ্ন করল। মঙ্গল বলল, "এটা এক বোকা শিবশর্মার মুক্তো। ব্যাটা, জানেই না এর দাম কত।"

মুক্তোটির বিষয়ে স্বামীর কাছে শুনে মঙ্গল শেঠের বউ তাকে বলল, "ঠিক এই ধরণের একটি নকল মুক্তো কিনে রেখে দাও। শিবশর্মা যখন মুক্তো ছাড়াতে আসবে তখন ওই নকল মুক্তোটা দিয়ে দিও।"

এমনিতেই মঙ্গল শেঠ ভীষণ লোভী ছিল। বউয়ের এই বুদ্ধি তার ভীষণ ভাল লাগল। সে ঠিক ওই ধরণের একটি নকল মুক্তো কিনে আনল।

কিছুদিন পরে শিবশর্মা ব্যবসায়ে দাঁড়িয়ে গেল। সে সুদ সমেত সমস্ত টাকা মঙ্গল শেঠকে ফেরত দিয়ে মুক্তো ছাড়াতে এল।

মঙ্গল শেঠ বারবার টাকা পয়সা গুণে হিসেব করে গুছিয়ে রেখে নকল মুক্তোটি শিবশর্মাকে দিয়ে দিল।

বাড়িতে গিয়ে মুক্তোটি যত্ন করে রাখার সময় শিবশর্মার মনে হল, "এ মুক্তো সে

পুলক দাস

মুক্তো নয়।" সন্দেহ মেটানোর জন্য সে সোজা বিচারকের কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে বলল যে সেটা তার মুক্তো নয় বলেই তার ধারণা। বিচারক যেন এ বিষয়ে তার করণীয় কর্তব্য করে।

বিচারক মুক্তোটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখে বুঝল যে সেটা নকল হলেও হতে পারে। বিচারক গোপনে মঙ্গল শেঠকে ডেকে ওই মুক্তো খাঁটি কিনা জানাতে বলল। মঙ্গল শেঠ মুক্তোটি হাতে নিয়ে পরমুহূর্তেই বলল, "এতো একেবারে কাঁচের টুকরো।"

বিচারক বুঝল যে মঙ্গল শেঠ শিবশর্মাকে ঠকিয়েছে। কিভাবে মঙ্গল শেঠকে অপরাধী প্রমাণ করা যায় মনে মনে তার একটা পরিকল্পনা বিচারক করে নিল। শিবশর্মাকেও বিচারক যা বলার গোপনে বলে দিল।

পরের দিন বিচারকের পরামর্শ অনুযায়ী শিবশর্মা মঙ্গল শেঠের কাছে গিয়ে বলল, "এই মুক্তোটা আমার নয়। আমার মুক্তো আমায় ফেরৎ দাও।"

"কি আজেবাজে কথা বলছ? তোমার মুক্তোই তোমায় দিয়েছি। তোমার মুক্তো নিয়ে আমি কি করবো? আমি কি মুক্তোর ব্যবসায়ী যে অন্য যায়গায় মুক্তো বিক্রি করব?"

"ঠিক আছে, তাহলে চল বিচারকের কাছে।" বলে শিবশর্মা মঙ্গল শেঠকে নিয়ে বিচারকের কাছে গেল।

বিচারক শিবশর্মার কথা এই প্রথম শোনার অভিনয় করে মঙ্গল শেঠকে বলল, "দেখুন, আপনি বলছেন শিবশর্মার মুক্তোই তাকে ফেরৎ দিয়েছেন। আর শিবশর্মা বলছেন এই মুক্তো সেই মুক্তো নয়। এটা নকল। এখন এক কাজ করা যাক, খাঁটি মুক্তো যে চেনে তাকে দিয়ে পরীক্ষা করান যাক।"

কথাটা কানে যেতেই মঙ্গল শেঠ খুব ভয় পেল। তৎক্ষণাৎ কি যেন ভেবে ভবিষ্যত কর্মপন্থা তাড়াতাড়ি ঠিক করে নিল মঙ্গল শেঠ।

মুক্তো-পরীক্ষক এল। অনেকক্ষণ মুক্তোটি নেড়ে চেড়ে পরীক্ষা করে বলল, "না না এতো নকল মুক্তো নয়! এতো খুব দামী মুক্তো!"

কথাটা কানে যেতেই মঙ্গল শেঠের রক্ত হিম হয়ে গেল। তার বুক ফেটে যাচ্ছিল কিন্তু মুখে কথা ছিল না। এভাবে হাতে নাতে ধরা পড়বে সে কথা সে কোনদিন কল্পনাও করেনি।

বিচারক শিবশর্মাকে বলল, "মঙ্গল শেঠ একজন সৎ লোক। তার নামে এই ধরণের মিথ্যা অপবাদ দেওয়া আপনার খুব অন্যায় হয়েছে। আপনি তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন।" শিবশর্মা তাই করল।

মঙ্গল শেঠ বাড়ি ফিরে গিয়ে মনে মনে বলল, কি হল! আসল মুক্তো নকল মুক্তো ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে শেষে কি আসল-টাই শিবশর্মার কাছে চলে গেল? মনের কথা আর কতক্ষণই বা মনে চেপে রাখা যায়! শেষে সে বউকে বলল, "ওগো আমাদের সর্বনাশ হয়েছে! তোমাকে বার বার বলেছিলাম আসল আর নকল মুক্তো নিয়ে ওভাবে তুমি নাড়াচাড়া করো না। এত কাণ্ড করে শেষে আসল মুক্তোটাই শিবশর্মার হাতে চলে গেছে। তুমি তাড়াতাড়ি কোথায় রেখেছ ওই মুক্তোটা নিয়ে এসো তো!"

মঙ্গল শেঠের বউ হাঁকপাঁক করে গোপন জায়গা থেকে মুক্তোটি বের করে, পাছে কেউ দেখে ফেলে সেই ভয়ে দরজা জানলা বন্ধ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। দেখল জানলা দিয়ে ভিতরের দিকে তাকিয়ে আছে গ্রাম-প্রধান আর শিবশর্মা।

পরে গ্রাম-প্রধানের নির্দেশে তাদের দরজা খুলতে হল। আসল মুক্তো শিব-শর্মাকে দিতে হল। বিচারকের নির্দেশে অনেক টাকা মঙ্গল শেঠকে জরিমানা দিতে হল শিবশর্মাকে।

মাথার দাম

একদিন রাজা অশোক মন্ত্রীসহ যাবার সময় এক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে দেখতে পেয়ে অশোক ঐ বৌদ্ধ ভিক্ষুর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন।

পরে একদিন মন্ত্রী রাজা অশোককে বলল, "মহারাজ, পথে যত ভিক্ষু পড়বে তাদের প্রত্যেকের পায়ে মাথা ঠেকানো আপনার পক্ষে মর্যাদার নয়।"

পরের দিন রাজা অশোক মন্ত্রীর হাতে একটি পাঁঠার মাথা, একটি বাঘের মাথা ও একটি মরা মানুষের মাথা দিয়ে ওগুলো বিক্রি করে আসতে বললেন। মন্ত্রী ঐ তিনটি মাথা রাজকর্মচারীদের দিয়ে বইয়ে বাজারে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাঁঠার মাথা বিক্রি হয়ে গেল। আর একটু পরেই বাঘের মাথাটাও এক ধনী লোক দেয়ালের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কিনে নিলেন। কিন্তু সারাদিন ধরে চেষ্টা করেও মানুষের মাথাটা বিক্রি করা গেল না। বাধ্য হয়ে ওই মাথা নিয়ে মন্ত্রী রাজা অশোকের কাছে ফিরে এল।

"দেখলেন তো মন্ত্রী, মানুষের মাথার কোন দাম নেই। সেই মাথা বৌদ্ধ ভিক্ষুর পায়ে ঠেকালে কি মানসম্মান চলে যাবে?" রাজা অশোক বললেন।

বিড়ালের চোখ

প্রাচীনকালে এক রাজার চারটি ছেলে ছিল। চার রাজপুত্র সব সময় অন্তঃপুরেই থাকত। তাদের এই অভ্যেস রাজার ভাল লাগত না। বাইরে না বেরুলে অভিজ্ঞতা বাড়ে না। অভিজ্ঞতা না থাকলে রাজ্য শাসন করা যায় না। উত্তরাধিকারী নির্বাচনের জন্য রাজা ভাবনায় পড়লেন।

একদিন চারজনে একটি ঘরে বসে খুব মনোযোগ দিয়ে দাবা খেলছিল। রাজা হঠাৎ তাদের কাছে হাজির হয়ে বললেন, "প্রাসাদে থেকে আমি নিজের চোখে বাইরের কোন ঘটনা দেখতে পারি না। অনুচররা এসে যা বলে তাই বিশ্বাস করতে হয়। এখন তোমরা একটি কাজ করলে আমি খুশী হব। তোমরা চারজনে চারদিকে যাও। যে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে ফিরে এসে আমাকে তা জানাও।"

পরের দিন ভোর রাত্রে চার রাজকুমার চারটি ঘোড়ায় চড়ে রওনা হয়ে গেল। দেশের সীমা পেরিয়ে এক বনে ঢোকার আগে বড় রাজকুমার বলল, "আমরা চারজনে চারদিকে যাই। যার যা অভিজ্ঞতা হবে ফিরে এসে বাবাবে জানাবে।" বলে বড় রাজকুমার ঘোড়া ছুটিয়ে উত্তর দিকে চলে গেল।

বড়র চলে যাওয়ার পর মেজ রাজকুমার ভাবল, "দাদা একা চলে গেছে কখন কি হয় কে জানে। যদি কিছু বিপদ হয় কে দেখবে কে বাঁচাবে।" এসব ভাবতে ভাবতে সেও উত্তর দিকেই গেল।"

বড় এবং মেজোর একই দিকে যাওয়ার পর সেজ মনে মনে ভাবল, "আমি একা আর অন্য দিকে কোথায় যাব, তার চেয়ে উত্তর দিকেই গেলে ওদের দুজনের খবর

পত্রলেখা সেন

রাখতে পারব।" একথা ভেবে সেও সেই দিকেই গেল।

তিন রাজকুমারের একদিকে যাওয়ার পর ছোট রাজকুমারও আর অন্যদিকে যাওয়ার কথা ভাবতে পারল না। তাই সেও তাদের অনুসরণ করল।

সন্ধ্যের সময় বড় রাজকুমার এক নদীর তীরে পৌঁছাল। ঐ নদীর তীরে আছে একটি ঘর। রাজকুমার ঠিক করল ঐ ঘরে সে এক রাত্রি কাটাবে। ঘোড়াটাকে নিচে রেখে রাজকুমার পাহাড়ে উঠে গেল।

নিচে থেকে যে ঘর ছোট মনে হয়েছিল উপরে উঠে দেখল সেটা বেশ বড়। ঘরের দরজায় বসে আছে বড় একটি বিড়াল। রাজকুমারকে দেখে বিড়ালটি বিচিত্র সুরে ডাকতে ডাকতে সরে গেল।

অনেকক্ষণ দরজায় টোকা মারার পর অল্প একটু ফাঁক করে এক যোগিণী বাইরের দিকে তাকাল। মাথায় তার বিরাট জটা, গায়ে বস্ত্র, গলায় ফুলের মালা, তার চোখ দুটো বিড়ালের চোখের মতই চিক্ চিক্ করছিল।

"ভেতরে এসে দরজা বন্ধ করে দাও।" বলে সে ভেতরে চলে গেল। বিড়াল আবার দরজায় গিয়ে বসল।

রাজকুমার ঘরের ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। যোগিণী একবার কুমারের

দিকে তাকিয়ে কুলুঙ্গি থেকে প্রদীপ বের করে ধরাল। ঘরে জানলা দিয়ে বেশ হাওয়া ঢুকছিল। নদীর উপর দিয়ে হাওয়া আসায় হাওয়াটা ছিল বেশ ঠাণ্ডা।

"খাওয়ার কিছু আছে?" রাজকুমার জিজ্ঞেস করল।

"মাছ খাবে? না পান্তা ভাত খাবে?" যোগিণী জিজ্ঞেস করল।

"মাছ খাব।" বলল রাজকুমার।

"খাবে কেন? হয়ে যাও না?" বলে যোগিণী নিজের গলার মালা থেকে একটি ফুল ছিঁড়ে তার উপর ছুঁড়ে মারল। মুহূর্তে রাজকুমার মাছে রূপান্তরিত হয়ে ছটফট করতে লাগল। যোগিণী হো হো করে

হাসতে হাসতে জলভরা হাঁড়িতে ফেলে দিল।

ইতিমধ্যে মেজো রাজকুমার ঐ নদীর তীরে এসে দেখতে পেল তার দাদার ঘোড়া সেখানে চরে বেড়াচ্ছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে সে দেখতে পেল পাহাড়ের উপর একটি ছোট ঘর। ভাবল দাদা নিশ্চয় ঐ ঘরেই গেছে। সেও ঘোড়াটাকে নিচে রেখে পাহাড়ে উঠে গেল।

মেজো রাজকুমারকে দেখে ঐ বিড়াল বিচিত্র স্বরে ডাকতে ডাকতে সেখান থেকে সরে গেল। মেজ রাজকুমার দরজায় করাঘাত করল। দরজা খুলে যোগিণী তাকে দেখে বলল, "ভেতরে এসে দরজা বন্ধ করে দাও।" ইতিমধ্যে বিড়ালটা ঘরে ঢুকে গেল।

মেজো রাজকুমার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। সেও খাবারের কথা জিজ্ঞেস করলে যোগিণী তাকে বলল, "রান্নার জন্য মাছ তো হাঁড়িতে আছে কিন্তু রূপোর থালাও নেই কলাপাতাও নেই। কোনটা তোমার পছন্দ বল তো?"

"রূপোর থালা।" রাজকুমার বলল।

"তবে তুমি রূপোর থালাই হও।" এই বলে যোগিণী তার গলার মালা থেকে একটি ফুল তার উপর ছুঁড়ে মারল।

মেজো রাজকুমার রূপোর থালায় রূপান্তরিত হল। যোগিণী হো হো করে হাসতে লাগল। ঠিক তখন আবার দরজায় করাঘাত শোনা গেল। সেজো রাজকুমারও যথারীতি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল।

"খিদের জ্বালায় পেট জ্বলে যাচ্ছে। কিছু আছে?" সেজো রাজকুমার জিজ্ঞেস করল।

"মাছ আছে থালা আছে। ঘুমোনোর জন্য তোমার কি চাই? গদির বিছানা না মাদুর?" যোগিনী জিজ্ঞেস করল।

"গদির বিছানা চাই।" রাজকুমার বলল।

যোগিণী তাকে একই পদ্ধতিতে গদির বিছানায় রূপান্তরিত করে রান্নার কাজ শুরু করল।

তিনটি ঘোড়া নদীর তীরে বাঁধা দেখে ছোট রাজকুমার একবার চারদিকে তাকিয়ে পাহাড়ের উপর ঐ ঘর দেখতে পেল। বুঝল তিন ভাই ওখানেই গেছে। সেও পাহাড়ে উঠল। ছোট রাজকুমার ঐ ঘরের দরজার কাছে পৌঁছাতেই বিড়াল ডাকতে আরম্ভ করে দিল। ভয়ঙ্কর বিচিত্র স্বরের সে ডাক। দরজা খুলে গেল। ছোট কুমার যোগিণীকে দেখতে পেল।

ঘরে ঢুকে ছোট রাজকুমার বলল, "আমার তিন দাদা এখানে এসেছিল তাদের দেখতে পাচ্ছি না কেন?"

"কে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তার খোঁজ আমি দেব কি করে?" যোগিণী বলল।

ঐ ঘরের পরিবেশ, বিড়াল আর যোগিণী-কে দেখে রাজকুমারের মনে কেমন যেন সন্দেহ হল।

সে কোমরে বাঁধা কাপড়টাকে খুলে হঠাৎ বিড়ালটাকে তুলে নিয়ে কাপড়ে জড়িয়ে বগলদাবা করে দরজা বন্ধ করে দিল। পর-মুহূর্তেই জলভর্তি হাঁড়ি থেকে মাছ লাফিয়ে পড়ল রূপোর থালায়। কুমার দেখতে পেল বিছানায় একটি ফুল।

এসব দেখে কুমারের সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। ও কিছুই বলছে না দেখে যোগিণী আবার বলল, "এ মাছটা রান্না করে দেব।"

"কি দরকার? খাবার তো আমার বগলেই আছে?" বলল ছোট রাজকুমার।

"সেটা খেতেও তো থালা লাগবে। রূপোর থালা দেব?" যোগিণী বলল।

"থালা কি দরকার? এটাতো আমার এক গ্রাসের খাবার।" কুমার বলল।

ততক্ষণে বিড়ালের চোখ টকটকে লাল হয়ে গেল।

"খাবার পর শোবার জন্যেও তো গদির বিছানা চাই?" যোগিণী বলল।

"ঘাসের উপর যে শুয়ে কাটায় তার আবার গদি কি দরকার?" রাজকুমার বলল।

যোগিণীর ভীষণ রাগ হল ওর কথা শুনে। রাগের মাথায় সে হঠাৎ বলে ফেলল,

"ঐ তিনজনের চেয়ে তুমি দেখছি বেশি চালাক।" বলে মালা থেকে ফুল ছিঁড়তে যাবে এমন সময় বগলে থাকা বিড়ালটি আর্তনাদ করে উঠল। কুমার তৎক্ষনাৎ ঐ মালা ছিঁড়ে ফেলে বিড়ালটাকে যোগিণীর উপর ছুঁড়ে দিল। বিড়াল যোগিণীর সমস্ত মুখ খামচে দিয়ে তার দুটো চোখ উপড়ে ফেলল। যোগিণী ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করতে করতে বেরিয়ে পা হড়কে পাহাড় থেকে গড়াতে গড়াতে নদীতে পড়ে গেল।

রাজকুমার ঐ মালাটিকে ছুঁড়ে ফেলল জানলা দিয়ে নদীতে।

পরক্ষণেই মাছ, রূপোর থালা ও গদির বিছানা যথাক্রমে বড়, মেজো ও সেজো রাজকুমারে রূপান্তরিত হল।

"যা দেখেছি, যা শুনেছি তা যথেষ্ট। এবার চল ফিরে যাই।" বড় রাজকুমার বলল। চার ভাই বিড়ালটা কত খুঁজল কিন্তু পেল না।

কুমারদের এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে দেখে রাজা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। "এবার বল কার কি অভিজ্ঞতা হয়েছে।" রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

মাছ, রূপোর থালা ও গদির বিছানায় রূপান্তরিত হওয়ার ঘটনা যথাক্রমে বড়, মেজো ও সেজো রাজকুমার বিস্তারিত ভাবে রাজাকে বলল।

আর ছোট রাজকুমারের অভিজ্ঞতা একেবারে ভিন্ন ধরণের। সে জানাল কি ভাবে একটি মাছ, রূপোর থালা ও গদির বিছানা যথাক্রমে তার বড়, মেজো ও সেজো ভাই হয়ে গেল।

রাজা বুঝতে পারলেন যে ভবিষ্যতে ছোট রাজকুমারের উপর তিনি নির্ভর করতে পারবেন। উত্তরাধিকার সম্পর্কে রাজার অনেকদিনের দুশ্চিন্তাও দূর হল।

রাজা খুশী হয়ে হাসতে হাসতে ছোট রাজকুমারের পিঠ চাপড়ালেন।

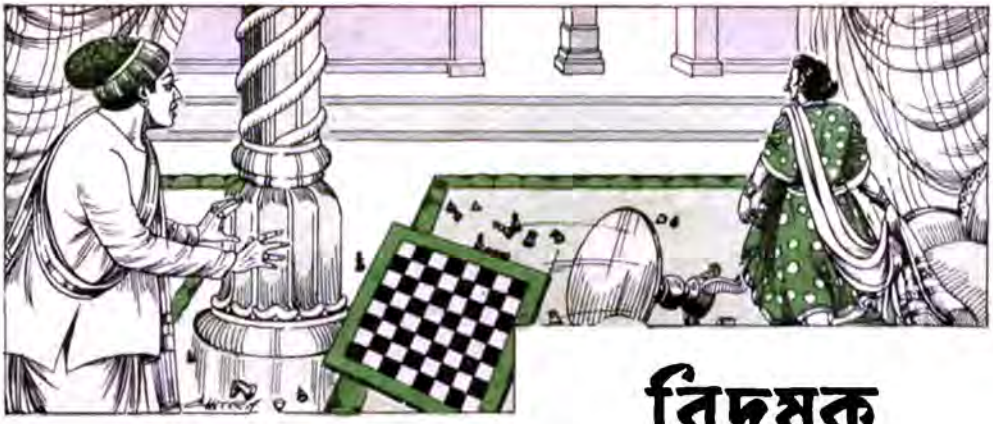

বিদূষক

কঙ্ক দেশের রাজা ছিলেন চন্দ্রপাল। তাঁর মেজাজ ঠিক রাখার জন্য বিদূষক সব সময় চেষ্টা করতো। রাজা দাবা খেলতে ভালবাসতেন। বিদূষকের সঙ্গে রাজা প্রত্যেকদিন দাবা খেলায় জিততেন।

একদিন রাজা অন্যমনস্কভাবে দাবা খেলে হেরে গেলেন। রাজার ভীষণ বিরক্তি জাগলো। হঠাৎ দাবার গুটি ছুঁড়ে ফেলে রাজা উঠে পড়লেন।

তারপর তিনি সোজা স্নানঘরে গেলেন। তাড়াহুড়ো করে চান করতে গিয়ে জগ পায়ে পড়লো। জগ ওখানে কে রাখলো সে খোঁজ করে রাজা তাকে শাস্তি দিল।

স্নান সেরে উঠে বিরক্তির সঙ্গে পোষাক পরতে গিয়ে পোষাক গেল ছিঁড়ে। তৎক্ষণাৎ যার পোষাক রক্ষরাবেক্ষনের ভার ছিল তাকে ডেকে কঠিন শাস্তি দিলেন।

অনেকক্ষণ ধরে রাজাকে তিক্তবিরক্ত দেখে রাজকর্মচারীরা ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। তাই পোষাক পরার পরে রাজার পায়ে যারা জুতো পরিয়ে দেয় তারা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে রাজার পায়ে জুতো পরিয়ে দিল। তবে তাড়াতাড়ি জুতো পরাতে গিয়ে ডান পায়ের জুতো বাঁ পায়ে ঢুকে গেল আর বাঁ পায়ের জুতো ডান পায়ে ঢুকে গেল। ঠিক সেই সময়ে রাজা পাশের ঘর থেকে শুনতে পেলেন বিদূষক কাকে যেন দাবা খেলায় রাজার হেরে যাওয়ার কথা সগর্বে বলছে। শুনে রাজার রাগের আগুনে যেন ঘি পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে রাজা সেনাপতিকে ডেকে, যারা জুতো পরিয়ে দিল তাদের, যে জগ রেখেছিল তাকে, যে পোষাকরক্ষক তাকে এবং বিদূষককে বন্দী করতে বললেন।

অনিমা দেবী

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেনাপতি সবাইকে বন্দী করে রাজার সামনে হাজির করলো।

"কালকেই এদের প্রত্যেককে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দাও।" রাজা বললেন।

কিন্তু পরের দিন সকালে রাজার সমস্ত রাগ জল হয়ে গেল। তখন রাজা ওদের বললেন, "তোমাদের সবাইকে ফাঁসিতে ঝোলানো আমার ইচ্ছে নয়, তোমাদের মধ্য থেকে একজন ফাঁসির সাজা নিতে রাজি থাকলে অন্যদের ছেড়ে দেওয়া হবে।"

তৎক্ষণাৎ বিদূষক এগিয়ে এসে বলল, "মহারাজ, এদের সকলের স্ত্রী, পুত্র পরিবার আছে। এদের ছেড়ে দিন আমাকে ফাঁসি দিন। আমার কেউ নেই।"

রাজা ওদের ছেড়ে দিয়ে বিদূষককে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমারই বা স্ত্রী পুত্র পরিবার নেই কেন?"

"মহারাজ, আমার কাছে টাকা পয়সা নেই কে আমাকে মেয়ে দেবে। তবে ফাঁসির আগে আপনাকে একটা অনুরোধ করব, আমার শ্রাদ্ধের কাজ করার জন্য, আমার পিণ্ডি দেওয়ার জন্য যতদিন না আমার একটি ছেলে হয়, ততদিন আমার ফাঁসি মুলতুবী রাখুন।" বিদূষক বলল।

রাজা মনে মনে হেসে নিজেই বিদূষকের জন্য মেয়ে খুঁজে তার বিয়ে দিলেন।

বছর ঘুরতেই বিদূষকের ছেলে হল।

তখন রাজা বিদূষককে ডেকে বললেন, "এখন তো তোমার ছেলে হয়েছে। তোমার পিণ্ডি দেওয়ার লোকের অভাব নেই। এখন তাহলে তোমার ফাঁসির আদেশ কার্যকরী করা যেতে পারে?"

"তা কেন মহারাজ, গত বছর স্ত্রী পুত্র পরিবার আছে বলেই তো ওদের ফাঁসি মকুব করেছিলেন। আমারও তো স্ত্রী পুত্র পরিবার আছে।" বিদূষক বলল।

রাজা হাসতে হাসতে বললেন, "বেশ, তাহলে তোমারও ফাঁসি মকুব করছি।"

মহাভারত

নকুল মৃদু হেসে বলল, "দ্বিজগণ, আমি মিথ্যে বলিনি। অহঙ্কার করেও বলিনি। ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে এক ব্রাহ্মণ কপোতের মত উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবন অতিবাহিত করতেন। কিন্তু একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষের ফলে তাঁর সঞ্চয় শেষ হয়ে গেল। তখন অতি কষ্টে সামান্য যব সংগ্রহ করলেন এবং তা থেকে শকৃতু তৈরি করলেন। জপ, আহ্নিক ও হোম করার পর তিনি সপরিবারে যখন আহারের আয়োজন করলেন। ঠিক সেই সময়ে একজন ক্ষুধার্ত অতিথি ব্রাহ্মণ এসে খাবার চাইলেন। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ঐ ব্রাহ্মণ অতিথিকে সাদরে পাদ্য অর্ঘ্য ও আসন দিয়ে নিজের শকৃতুর ভাগ তাঁকে নিবেদন করলেন। অতিথি তা আহার করলেন কিন্তু তাঁর ক্ষুধা নিবৃত্তি হল না। তখন ব্রাহ্মণের স্ত্রী তাঁর নিজের ভাগ অতিথি ব্রাহ্মণকে দিতে বললেন।"

গৃহস্থ ব্রাহ্মণ তখন তাঁর ক্লান্ত শীর্ণা বৃদ্ধা পত্নীকে বললেন, "আমি তোমার ভাগ নিতে পারি না। কীট-পতঙ্গ-মৃগাদিও নিজের স্ত্রীকে পোষণ করে। সংসারের কাজ ধর্ম অর্থ কাম সেবা এ সবই স্ত্রীর সাহায্যে হয়। সেই স্ত্রীকে পালন না করলে নরকে স্থান হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণপত্নী নিজের শকৃতু অতিথি ব্রাহ্মণকে দিলেন। তাতেও তাঁর ক্ষুধা মিটল না।

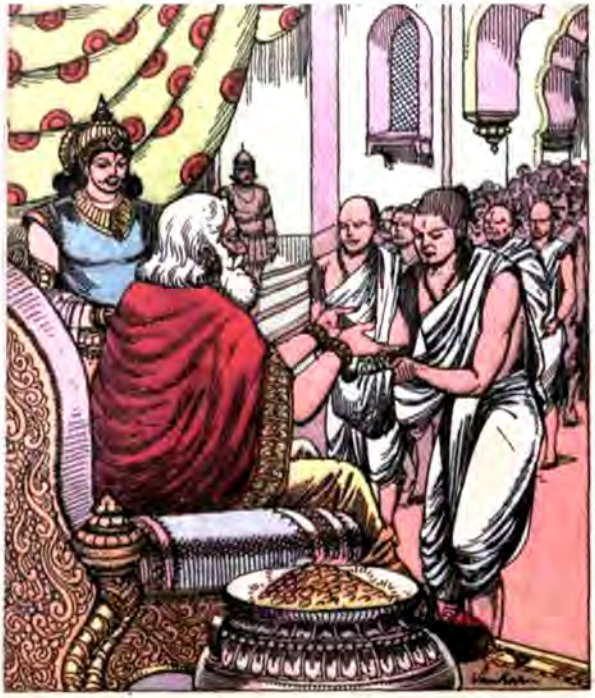

তখন ব্রাহ্মণের ছেলে নিজের ভাগ দিতে বললেন।"

ছেলেকে ব্রাহ্মণ বললেন, "হাজার বছর বয়স হলেও তুমি আমার কাছে বালক। তোমার ভাগ আমি অতিথিকে দিতে পারবো না।"

ব্রাহ্মণপুত্র তথাপি নিজের অংশ অতিথিকে দিলেন। তবুও অতিথির ক্ষুধা দূর হল না। তখন ব্রাহ্মণের পুত্রবধূ নিজের ভাগ দিতে চাইলেন।

ব্রাহ্মণ পুত্রবধূকে বললেন, "হে কল্যাণী, তুমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, শীর্ণ ও বিবর্ণ তোমার দেহ। তুমি অনাহারে থাকবে এ আমি কি করে সহ্য করব?"

কিন্তু তথাপি পুত্রবধূ নিজের ভাগ অতিথিকে দিলেন। অতিথিরূপী ধর্ম তখন ব্রাহ্মণকে বললেন, "দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তোমার পবিত্র দান পেয়ে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। ঐ যে আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে। দেবতারা ও ঋষি প্রভৃতি তোমার এই দান দেখে বিস্মিত হয়ে স্তব করছেন। ক্ষুধায় প্রজ্ঞা, ধৈর্য ও ধর্ম-জ্ঞান নষ্ট হয়। কিন্তু তুমি ক্ষুধা দমন করেছ এবং স্ত্রী-পুত্রাদির স্নেহও অতিক্রম করে ধর্মের কাজ স্বর্গলোকের স্থান করেছ। শকৃতু দান করে আজ তুমি যা ফল পেলে বহু শত অশ্বমেধ যজ্ঞেও তা পায় না। দিব্য রথ প্রস্তুত। তুমি সপরিবারে এতে আরোহণ করে ব্রহ্মলোকে যাও।"

"অতিথিরূপী ধর্মের কথায় সপরিবারে ঐ ব্রাহ্মণ স্বর্গে গেলেন। তখন আমি গর্ত থেকে বেরিয়ে ভূমিতে লুটালাম। সিক্ত শকৃতুকণার গন্ধে, দিব্য পুষ্পের মর্দনে এবং সেই সাধু ব্রাহ্মণের দান ও তপস্যার প্রভাবে আমার মস্তক কাঞ্চনময় হল। আমার বাকি শরীরটাও এইরূপ হওয়ার আশায় আমি তপোবন ও যজ্ঞ-স্থানে ঘুরে বেড়ালাম। অতি আশা করে আমি কুরুরাজের এই যজ্ঞে এসেছি। কিন্তু আমার শরীর কাঞ্চনময় হল না। তাই আমি হেসে বলেছিলাম যে সেই

উঞ্ছজীবী ব্রাহ্মণের শক্তু দানের সঙ্গে আপনাদের এই যজ্ঞের তুলনা হয় না।" এই বলে নকুল সেখান থেকে চলে গেল।

যুদ্ধে জয়লাভ করার পর পাণ্ডবরা ছত্রিশ বছর রাজ্যশাসন করেছিলেন। তাঁরা ধৃত-রাষ্ট্রের সম্মতি নিয়ে প্রথম পনের বছর সমস্ত কাজ করতেন। সঞ্জয়, বিদুর, যুযুৎসু ও কৃপাচার্য ধৃতরাষ্ট্রের কাছে থাকতেন। বৃদ্ধ কুরুরাজকে ব্যাসদেব সব সময় শোনাতেন দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ ও রাক্ষস ইত্যাদির কথা। বিদুর ধর্ম আর মকদ্দমা বিষয়ক কাজ দেখাশোনা করতে লাগলেন। তাঁর সুষ্ঠু নীতির জন্য সামন্ত রাজাদের কাছ থেকে সামান্য খরচে নানা প্রকার অভীষ্ট কাজ পাওয়া যেত। তিনি যদি কোন অপরাধীকে মুক্তি দিতেন যুধিষ্ঠির কোন আপত্তি করতেন না। তাছাড়া কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উলূপী, চিত্রাঙ্গদা, জরাসন্ধের কন্যা ইত্যাদি সকলেই গান্ধারীর সেবা যত্ন করতেন।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের সকলকেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন, যেন পুত্রহীন ধৃতরাষ্ট্র কোন দুঃখ না পান। তাঁর এই আদেশ সকলে যত্নের সঙ্গে পালন করতেন। একমাত্র ভীমই ভুলতে পারেন নি ধৃতরাষ্ট্রের পূর্বের সেই ব্যবহারের কথা।

যুধিষ্ঠির অন্যদের শুধু যে উপদেশ দিয়েছেন তাই নয়, তিনি নিজে অত্যন্ত

ভদ্র ও নম্র আচরণ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি করতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্রও তাঁদের মঙ্গলের জন্য প্রত্যেকদিন প্রার্থনা করতে লাগলেন। এত ভদ্র ব্যবহার পেয়ে তাঁর মনে হয়েছিল যে তিনি নিজের পুত্রদের কাছেও এত ভদ্র ব্যবহার পাননি।

এভাবে পনের বছর কেটে গেল। একমাত্র ভীম যুধিষ্ঠিরের অজ্ঞাতে ধৃত-রাষ্ট্রের অপ্রিয় কাজ করতেন এবং সুযোগ পেলেই অন্যরাও যাতে তাঁর কথা মত কাজ না করে সেজন্য চেষ্টা করতেন। একদিন ভীম ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বন্ধুদের বললেন, "আমার এই হাতের শক্তির জোরে বোকা দুর্যোধন ও

তার ছেলে ও বন্ধুরা মারা গেছে।" এই নিদারুন কথা কানে যেতেই ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত দুঃখ পেলেন। বুদ্ধিমতী গান্ধারী কোন কথা বললেন না!

এসব যুধিষ্ঠির, অর্জুন, নকুল, সহদেব, কুন্তী ও দ্রৌপদী জানতে পারেন নি।

একদিন ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "বৎস, তোমার এখানে আমি ভালই আছি। তুমি আমাকে খুব ভাল রেখেছ। দান ও শ্রাদ্ধ প্রভৃতির জন্য আমাকে অনেক খরচ করতে দিয়েছ। তার ফলে আমার পুণ্য সঞ্চয় হয়েছে। গান্ধারীও ধৈর্য ধরে আমার সঙ্গে আছে। যে দুর্বুদ্ধি ও অত্যাচারীগণ দ্রৌপদীকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে তোমাদের সমস্ত ঐশ্বর্য কেড়ে নিয়েছিল, তারা ক্ষত্রিয় ধর্ম অনুসারে স্বর্গলাভ করেছে। এখন আমাদের দুজনের যা শ্রেষ্ঠ ধর্ম তাই করা উচিত। তুমি ধার্মিক ও কর্তব্যপরায়ণ, তাই তোমাকে বলছি, এবার আমাকে ও গান্ধারীকে বনে যাবার অনুমতি দাও। বুড়ো বয়সে রাজ্যের ভার পুত্রের হাতে অর্পণ করে বনে বাস করাই আমাদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম।"

একথা শুনে যুধিষ্ঠির বললেন, "কুরু-রাজ, আপনি যদি কষ্ট পান তবে আমার সুখ শান্তি আনন্দ কোথায়? আমাকে ধিক! আপনাকে অসুখী রেখে আমার রাজ্যের কোন প্রয়োজন নেই। আপনি আমাদের পিতা ও পরম গুরু। আপনাকে ছেড়ে আমরা কোথায় কি করে থাকব পিতা? আপনি যাকে শ্রেষ্ঠ মনে করবেন তাঁর হাতে এই রাজ্যভার দিয়ে আমিও বনে যাব। আর না হয় আপনি নিজে রাজ্য শাসন করুন। আমাকে এভাবে কষ্ট দেবেন না। প্রকৃত রাজা তো আপনি। দুর্যোধনদের ঐরূপ ব্যবহারের জন্য আমার মনে বিন্দুমাত্র রাগ বিদ্বেষ নেই। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় আমরা একাজ করেছি। কুন্তী যেমন আমাদের মা তেমনি গান্ধারী ও আপনি আমাদের মা-বাবা। আপনার কাছে একমাত্র প্রার্থনা, মনের দুঃখ কষ্ট ত্যাগ করুন।"

এসব ঘটনার পর ব্যাসদেব এসে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "কুরুনন্দন, ধৃতরাষ্ট্র যা বলছেন যা চাইছেন তাতেই তুমি সম্মত হও। বৃদ্ধ বয়সে পুত্রদের হারিয়ে তাঁরা দুজনে শোকে কাতর হয়ে আছেন। অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধরে আছেন। তাঁদের বনে গমন করতে দাও। এখানে যেন তাঁদের মৃত্যু না হয়। শেষ সময়ে বনবাসই রাজাদের উপযুক্ত আশ্রয়। যুদ্ধক্ষেত্র অথবা বনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করাই শ্রেষ্ঠ রাজাদের ধর্ম। তাঁর তপস্যা করবার এই উপযুক্ত সময়। তোমার উপর এখন ধৃতরাষ্ট্রের আর সামান্যতম রাগও নেই।" এই বলে ব্যাসদেব চলে গেলেন।

তখন যুধিষ্ঠির অত্যন্ত নম্রভাবে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, "কুরুরাজ, আপনার ইচ্ছাকেই ব্যাসদেব সম্মতি দিয়েছেন। কিন্তু আমার অনুরোধ এখন আপনি আহার করে বিশ্রাম করুন। পরে বনাশ্রমে যাবেন।" শীর্ণকায় ধৃতরাষ্ট্র আস্তে আস্তে তাঁর ঘরে গেলেন। তারপর আহ্নিক করে আহার করলেন। গান্ধারী, কুন্তী ও অন্যান্য বধূগণ তাঁর সেবা যত্ন করতে লাগলেন। আহার শেষ করে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ করে রাজ্য পালন সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। তারপর গান্ধারীর কাছে গেলেন।

পরদিন সকালে বিদুর এসে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "আগামী কার্তিক পূর্ণিমায় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বনে গমন স্থির করেছেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধনাদি, জয়দ্রথ এবং মৃত অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের শ্রাদ্ধের জন্য তিনি সামান্য অর্থ চেয়েছেন।"

বিদুরের বক্তব্য শুনে যুধিষ্ঠির আনন্দিত হলেন। তিনি সানন্দে অর্থ দিতে রাজী হলেন। সব শুনে অর্জুনও সন্তুষ্টচিত্তে তা সমর্থন করলেন। কিন্তু ভীম কিছুতেই সামান্য অর্থও দিতে সম্মত হলেন না।

অর্জুন নানা কথায় ভীমকে বোঝাতে গিয়ে বললেন, "হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আমাদের বৃদ্ধ পিতা বনে যাবার পূর্বে দ্রোণ, ভীষ্ম

ইত্যাদির শ্রাদ্ধ করতে চান। আপনার শক্তির সাহায্যে যে অর্থ সংগ্রহ হয়েছে তা থেকে সামান্য অর্থ তিনি প্রার্থনা করছেন। দেখুন ভাগ্যের কি পরিহাস। পূর্বে আমরাই যাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থী হয়েছি তিনিই আজ আমাদের কাছে প্রার্থনা করছেন। তাঁকে আজ অর্থ না দিলে আমাদের লোকে নিন্দে করবে।"

অর্জুনের কথা শুনে ভীম সক্রোধে বললেন, "শ্রাদ্ধের জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে অর্থ দেওয়া মোটেই উচিত নয়। তাঁর অত্যাচারী পুত্ররা পরলোকে কষ্ট পাক। ভীষ্ম-দ্রোণাদির শ্রাদ্ধ আমরাই করব। তুমি কি পূর্বের সমস্ত ঘটনা ভুলে গেছ? সে সময়ে আমাদের জ্যেষ্ঠ তাতের স্নেহ ভালবাসা কি আমরা পেয়েছিলাম? দ্রোণ, ভীষ্ম তাঁরা কোথায় ছিলেন? দুর্বুদ্ধি-পরায়ণ এই ধৃতরাষ্ট্রই দ্যূতসভার বিদুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমরা জিতে কি পেলাম? সবই কি ভুলে গেছ তুমি?"

ব্যাকুল হয়ে যুধিষ্ঠির তাড়াতাড়ি ভীমকে বললেন, "ভাই, তুমি এবার ক্ষান্ত হও।"

পরে যুধিষ্ঠির বিদুরকে বললেন, "আপনি কুরুরাজকে বলুন, আমি আমার নিজের কোষ থেকেই অর্থ দেব। তাতে ভীমের আপত্তি হবে না। আমার ও অর্জুনের সমস্ত ধনের অধিকারী তিনিই।"

বিদুর গিয়ে যুধিষ্ঠিরের সমস্ত কথা জানালেন ধৃতরাষ্ট্রকে। শুনে তিনি খুব খুশী হলেন। বন্ধু-বান্ধবদের শ্রাদ্ধ করে ব্রাহ্মণদের প্রচুর অর্থ দান করলেন। কার্তিক পূর্ণিমায় যজ্ঞ করলেন এবং অগ্নি-হোত্র সামনে রেখে বনে যাত্রা করলেন।

শোকে অত্যন্ত কাতর হলেন যুধিষ্ঠির। অর্জুন তাঁকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। পাণ্ডবগণ, যুযুৎসু, বিদুর, সঞ্জয়, কৃপাচার্য ও ধৌম্য সজল চোখে অনুসরণ করলেন ধৃতরাষ্ট্রকে। কুন্তীর কাঁধে হাত রেখে গান্ধারী ও গান্ধারীর কাঁধে দুই হাত রেখে ধৃতরাষ্ট্র পথ চলতে লাগলেন। দ্রৌপদী, সুভদ্রা উলপী ও

চিত্রাঙ্গদা সকলেই চোখের জল ফেলতে ফেলতে তাঁদের পেছনে চলতে লাগলেন।

কিছুদূর যাবার পর ধৃতরাষ্ট্র সবাইকে ফিরে যেতে বললেন। কুন্তী গান্ধারীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "আমি বনবাসী হয়ে গান্ধারী ও কুরুরাজের সেবা করব।" ফিরে যেতে বললেন যুধিষ্ঠিরকে। তিনি যুধিষ্ঠিরকে আরও বললেন, "তুমি সহদেবকে দেখো। সে আমায় ও তোমায় খুব ভালবাসে এবং তোমারই ভক্ত। কর্ণকে মনে করে দান করো। দ্রৌপদীকে সকলে সন্তুষ্ট রেখো।"

যুধিষ্ঠির অত্যন্ত কাতর হয়ে কুন্তীকে ফেরাতে চেষ্টা করলেন। ভীম বললেন, বনেই যদি বাস করবেন তবে এ যুদ্ধের কি প্রয়োজন ছিল? কিন্তু কুন্তী কারও কথা শুনলেন না। রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "পাণ্ডুর পুত্র তোমরা। তোমরা বীরশ্রেষ্ঠ ও দেবতুল্য। জ্ঞাতির হাতে যাতে তোমাদের লাঞ্ছিত ও কষ্ট ভোগ না করতে হয় সে জন্যই যুদ্ধে তোমাদের উৎসাহিত করেছি। স্বামীর রাজত্বের সময়ে আমি যথেষ্ট সুখে ছিলাম। আর সুখ ভোগ করতে চাই না। পুণ্যধামে স্বামীর কাছেই যেতে চাই। গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের সেবা করেই দিন কাটাব বনে। তোমরা সকলে ফিরে যাও।"

ধৃতরাষ্ট্রও বললেন, "আপনি ফিরে যান যুধিষ্ঠিরের জননী। এই রাজঐশ্বর্য ও পুত্রদের রেখে কেন বনবাসী হবেন?"

গান্ধারীও পারলেন না কুন্তীর সঙ্কল্প ত্যাগ করাতে। নিরুপায় হয়ে দ্রৌপদী ও অন্যান্য বধূরা সকলে পাণ্ডবদের সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলেন হস্তিনাপুরে।

গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র ও কুন্তী বনে চলে যাওয়ার পর পুরবাসীরা সকলেই কাতর হয়ে পড়লেন এবং আলোচনা করতে লাগলেন, পুত্রহীন বৃদ্ধ কুরুরাজ, গান্ধারী ও কুন্তী না জানি বনে কত কষ্ট পাচ্ছেন। এই রাজ-ঐশ্বর্য, পুত্র ও পুত্রবধূদের ছেড়ে কেন তপস্যা করতে গেলেন!

মাতা কুন্তীর অনুপস্থিতিতে পাণ্ডবরা শোকার্ত হৃদয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। খুবই কাতর হয়ে পড়লেন সহদেব। কোন কাজেই তাঁরা মন দিয়ে করতে পারছিলেন না। এভাবে অস্থির চিত্তে থাকতে না পেরে শেষে একদিন ঠিক করলেন যে বনে গিয়ে তাঁরা সকলকে দেখে আসবেন। দ্রৌপদীও যাবেন স্থির হলো।

বনে যাবার জন্য রথ অশ্ব হাতী ও সৈন্য সবই সজ্জিত হয়ে প্রস্তুত হলো। পাঁচ দিন নগরের বাইরে কাটাবার পর ষষ্ঠ দিনে যুধিষ্ঠির সকলকে নিয়ে যাত্রা করলেন। অনেক পুরবাসীও সঙ্গে গেলেন।

আশ্রমের কাছাকাছি এসে সকলেই পায়ে হেঁটে এগোতে লাগলেন। পাণ্ডবরা তাড়াতাড়ি যমুনার দিকে চললেন। কিছু পথ যেতেই দেখলেন কুন্তী আগে আগে আসছেন ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে সঙ্গে নিয়ে। সহদেব আর স্থির থাকতে না পেরে কেঁদে লুটিয়ে পড়লেন কুন্তীর পায়ে। পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীকে প্রণাম করলেন। তাঁদের কাছ থেকে জলপূর্ণ কলস নিয়ে এগোলেন।

চারদিক থেকে তাপসগণ পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীদের দেখতে এলেন। সঞ্জয় তাঁদের সকলকে দেখিয়ে পরিচয় দিলেন। শুদ্ধ স্বর্ণকান্তি যাঁর দেহ, মহাসিংহের মত যিনি সবল, ইনিই কুরুরাজ যুধিষ্ঠির। এই দীর্ঘবাহু, মহাধনুর্ধর শ্যামবর্ণ আয়তলোচন, ইনি অর্জুন। কুন্তীর কাছে অনুপম রূপবান ও বলবান এঁরাই হলেন নকুল ও সহদেব। অর্জুনের পাশে যিনি মত্ত গজেন্দ্রগামী, স্থূল স্কন্ধ রয়েছেন, তিনিই ভীম। এই যে যাঁর চোখ পদ্মপলাশের মত, যাঁর রূপ মূর্তিমতি লক্ষ্মীর ন্যায়, ইনিই দ্রৌপদী। এভাবে একশত নারী যাঁরা উত্তরীয় ধারণ করেছিলেন, সেই ধৃতরাষ্ট্রের অনাথা পুত্রবধূদের পরিচয় দিলেন সঞ্জয়।

মিত্র-ভেদ

বার

তাঁতী রাজকুমারীকে কথা দেওয়ার পর মুহূর্ত থেকে দুশ্চিন্তায় ডুবে গেল। কি করা যায়? যত ভাবে তত তার দুশ্চিন্তা বাড়ে। কোথাও পালানোর কথাও ভাবল। গরুড় বাহনে চড়ে সহজেই পালানো যায় দূরে কোথাও? কিন্তু কত দূরে? কোথায়? আর চলে গেলে তার মানস পত্নীকে পাবে কি করে? বিক্রম সেন তো তার ভাবী শ্বশুরকে মেরে ফেলে তার মেয়েকে জোর করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে ফেলবে। বিক্রম সেনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেই তাকে মরতে হবে। আর প্রেমিকাকে ছেড়ে থাকা মানেই তার পক্ষে মরে বেঁচে থাকা। এক কাজ করলে কেমন হয়? বিষ্ণুরূপ ধারণ করে যুদ্ধ করতে গেলে শত্রুরা ভয় পেয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পালাতে পারে?

তাঁতী যখন এই ধরণের পরিকল্পনা করছিল তখন বৈকুণ্ঠে নারায়ণকে মর্ত-ভূমিতে যা যা ঘটেছে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে গরুড় তাঁকে বলল, "প্রভু, একটা সাধারণ তাঁতী আপনার রূপ ধারণ করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে আবার এখন আপনারই রূপ ধারণ করে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে। একবার যদি ঐ তাঁতীটা যুদ্ধ করতে করতে মারা যায় তাহলে পৃথিবীর মানুষ কি প্রভু, আপনাকে আর কোনদিন পুজো করবে? সব ঘটনা জানালাম। এখন আপনি যা ভাল মনে করেন তাই করবেন।"

শেষ প্রচ্ছদ চিত্র

একথার জবাবে নারায়ণ গরুড়কে বলেন, "পক্ষীরাজ, জোর করে কর আদায় করে, অনেক পাপ করেছে ঐ বিক্রম সেন। তার মৃত্যু এমনিতেই হবে। তাছাড়া সে আক্রমণ করতে যাচ্ছে যে রাজাকে সেই রাজার পরিবারের সকলে আমার ভক্ত। ও চেষ্টা করবে আমার ভক্ত পরিবারকে নির্মূল করতে। তাই ভাবছি আমি ঐ তাঁতীর চক্রের মধ্যে ঢুকে থাকব।"

সকালে তাঁতী গেল রাজকুমারীর কাছে। যুদ্ধ করতে যাওয়ার কথা তাকে জানাল। রাজা নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গেল। উভয় পক্ষের সেনার মধ্যে যুদ্ধ শুরু হল। তাঁতী ঐ গরুড় বাহনে চড়ে শত্রু সেনার সামনে আকাশে স্থির হয়ে থেকে জোরে শঙ্খ বাজাল। শঙ্খনাদ শুনে শত্রুপক্ষের সেনারা ভাবল যে স্বয়ং বিষ্ণু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছেন। একথা ভাবতেই তাদের শরীর ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। কয়েকজন জ্ঞান হারাল। আরও কয়েকজন সেনা হাঁ করে নির্বাক দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। ঠিক সেই সময় তাঁতী চক্রটিকে বিক্রম সেনের দিকে ছুঁড়ে দিল। সেটা বিক্রম সেনকে ছুটুকরো করে আবার তাঁতীর হাতে ফিরে এল। সেনাদের প্রত্যেকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল তাঁতীকে।

"এখন থেকে তোমরা সুপ্রতিবর্মার অধীনে থাকবে। তাহলে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না।" তাঁতী বলল।

তার কথায় সবাই রাজী হল। বিক্রম সেনের সমস্ত সম্পত্তির মালিক হল সুপ্রতিবর্মা। রাজকুমারীকে বিয়ে করে সারা জীবন তাঁতীটা সুখেই কাটাল।

দমনকের কাছে তাঁতী ও বিষ্ণুর কাহিনী শুনে করটক বলল, "ঠিক আছে, তোমার যখন অতটা বিশ্বাস আছে তখন তুমি পিঙ্গলকের কাছে গিয়ে তোমার বুদ্ধি খাটে কিনা দেখ। তোমার জয় হোক।"

দমনক পিঙ্গলকের কাছে গিয়ে, নুয়ে নমস্কার করে অনুমতি নিয়ে বসল।

"এতদিন আমার কাছে এলে না কেন?" পিঙ্গলক জিজ্ঞেস করল।

"একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানাতে এসেছি। এমন একটা সময় আসে যখন ভৃত্যকে অপ্রিয় হলেও সত্য কথা বলতে হয়। তাতে ঝুঁকি থাকে। বিপদও থাকে। কিন্তু ঐ কথা না বলে উপায় থাকে না। একমাত্র বিশ্বাসী ভৃত্যরাই অপ্রিয় সত্য কথা প্রভুর কাছে উচ্চারণ করতে পারে অন্য কেউ নয়।" বলল দমনক।

"কি বলতে চাও তুমি, বল না।" পিঙ্গলক সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল।

"মহারাজ, যাকে আপনি আশ্রয় দিলেন, যার সুখ সুবিধার দিকে নজর রাখেন সেই সঞ্জীবক আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে। আপনার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলে বেড়াচ্ছে। আজকেই নাকি ওরা বিদ্রোহ করবে। আমি এ খবর পেয়ে আপনাকে জানানো কর্তব্য মনে করেছি।" বলল দমনক।

এই কথা শুনে পিঙ্গলক ভয় পেয়েছে লক্ষ্য করে দমনক বলল, "আগাছা উপড়ে ফেলতে হয়। শত্রুকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থই মৃত্যু। শাসনকাজের কিছু কিছু ভার এই বলদকে দিয়ে ভুল করেছেন মনে হচ্ছে।"

"আমি তো সঞ্জিবকের কোন ক্ষতি করিনি? হঠাৎ ও আমার উপর রেগে গেল কেন?" পিঙ্গলক জিজ্ঞেস করল।

"যারা দুরাত্মা তারা কি কোন যুক্তি মেনে চলে মহারাজ? ওরা সব সময় ক্ষতি করার তালে থাকে? যে বলদের এই অরণ্যে ঢোকার কোন কারণ ছিল না, কোন পথ ছিল না, আপনি সেই বলদকে অনুগ্রহ করে আশ্রয় দিলেন। আর সে যে হাতে খেতে পায় সেই হাতটাকেই কামড়াতে চাইছে।" আপনি কৃতঘ্নের কাহিনী শোনেন নি?

"কোন্ কাহিনী, শুনিনি তো?" বলল পিঙ্গলক। দমনক কাহিনী শুরু করল।

কৃতঘ্নের কাহিনী

যজ্ঞদত্ত নামে এক অতি কুঁড়ে ব্রাহ্মণ ছিল। তার ছিল বহু কাচ্চাবাচ্চা। সারা দিন সে শুয়ে বসে থাকত। এক দিন

আর সহ্য করতে না পেরে তার বউ তাকে বলল, "অকম্মার ঢেঁকি কোথাকার! বসে বসে মজা দেখছ? তোমার ছেলে-মেয়েরা না খেতে পেয়ে মরতে বসেছে আর তুমি আরামে শুয়ে আছ? যেন তোমার কিছুই হয়নি এমন ভাব করে আরাম খাচ্ছ? যাও, কোন জায়গা থেকে যে কোন ভাবে কিছু রোজগার করে নিয়ে এসো। যাও, বেরোও ঘর থেকে।"

বউএর কাছ থেকে এই কথা শুনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে হাঁটতে লাগল। যেতে যেতে এক অরণ্য পড়ল। তার খুব জল তেষ্টা পেল। সেটা ছিল কীকারণ্য। জলের খোঁজ করতে করতে তার নজরে পড়ল এক কুয়ো। তার চার দিকে ঘাস গজিয়ে গিয়েছিল। সেই কুয়োতে কি আছে দেখার জন্য উঁকি মারতেই ব্রাহ্মণের নজরে পড়ল একটা বাঘ, একটা বাঁদর, একটা সাপ ও একটা মানুষ।

বাঘ যজ্ঞদত্তকে বলল, "জীবন রক্ষার চেয়ে বড় পুণ্য কাজ আর হয় না। তাই বলছি আমাকে এখান থেকে তোলার ব্যবস্থা কর। আমাকে আমার আপন জনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার সুযোগ দাও।"

"তুমি হলে বাঘ। তোমার নাম শুনলেই মনে ভয় ঢুকে যায়। তোমাকে কোন্ ভরসায় তুলব?" বলল যজ্ঞদত্ত।

"দেখ ভাই, যে কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কিন্তু কৃতঘ্নতার কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই। তোমার কোন ভয় নেই। দয়া করে আমাকে উপরে তোল।" বাঘ বলল।

জীবন রক্ষার চেয়ে পুণ্য কাজ আর নেই ভেবে ব্রাহ্মণ লতা দিয়ে শক্ত দড়ি বানিয়ে বাঘকে উপরে তুলল।

তারপর বাঁদরও অনুরোধ করল তাকে উপরে তুলে নিতে। সে ঐ বাঁদরকেও উপরে তুলল।

প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ

চার হাজার বছর আগে ব্যাবিলোনিয়ানরা সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। "মার্ডুক" ওদের দেবতা ছিলেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে মার্ডুক দেবতার মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। ব্যাবিলোন নগর বাগদাদের দক্ষিণে ছিল।

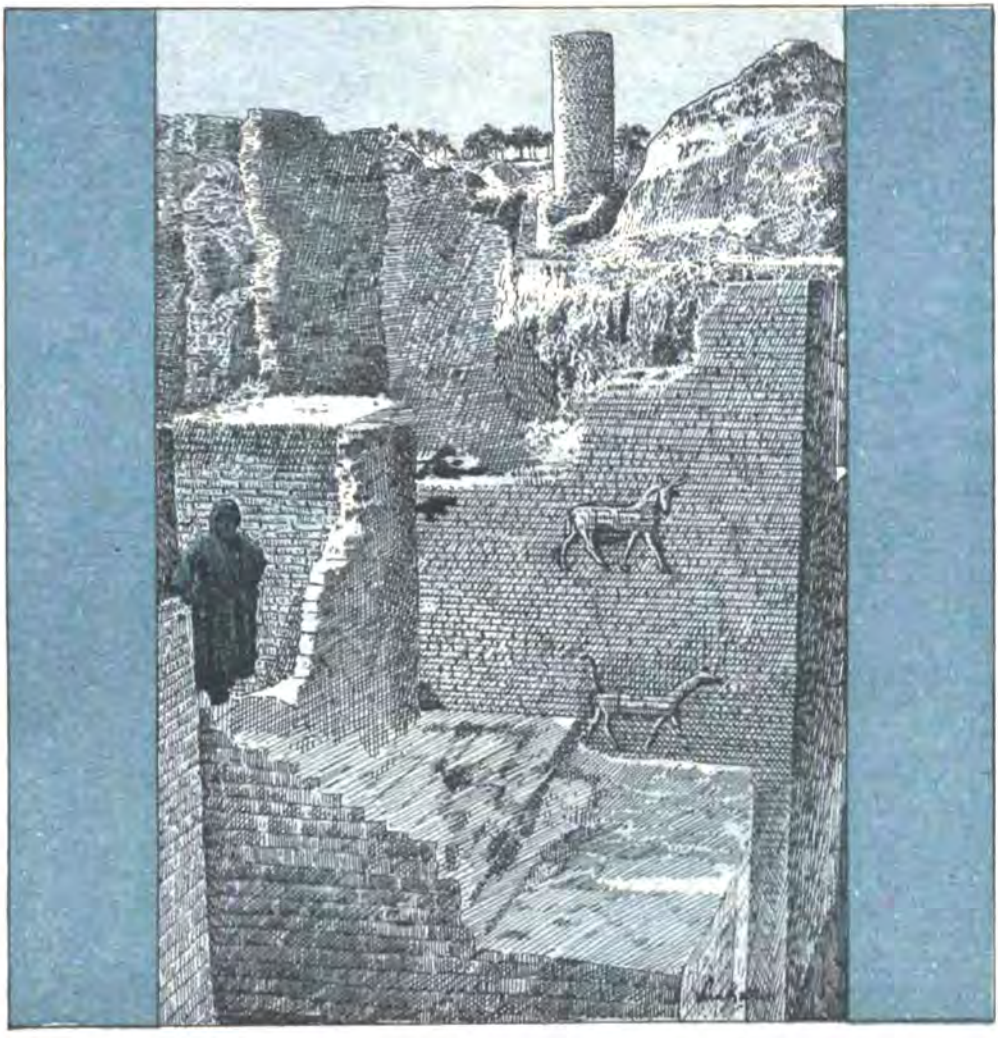

ফটো : অনন্ত দেশাই

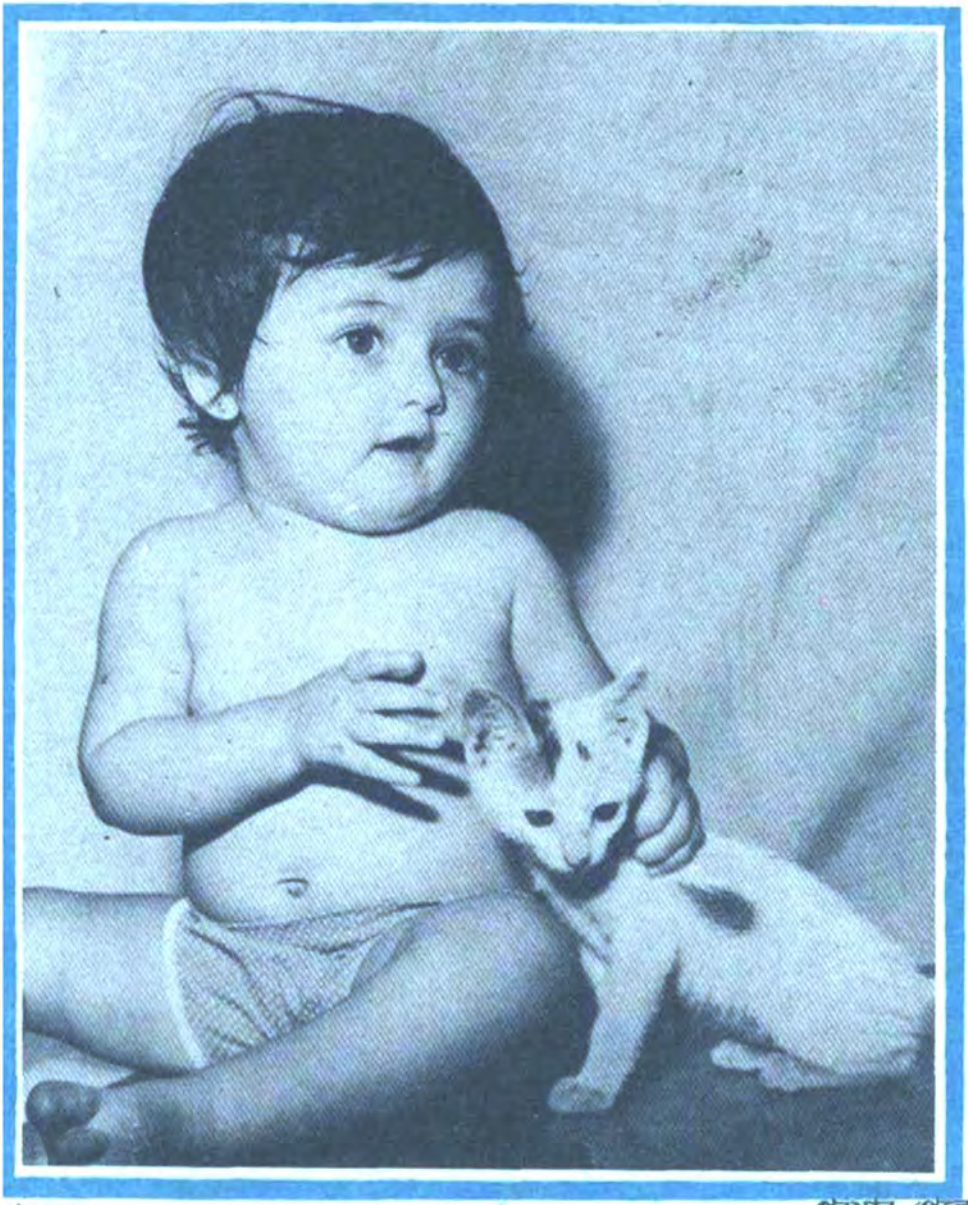

পুরস্কৃত নাম

বাঘের মাসিকে আমিও খেলাই

পুরস্কার পেলেন
সমর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ফটো : এস্. বি. তাকলকর

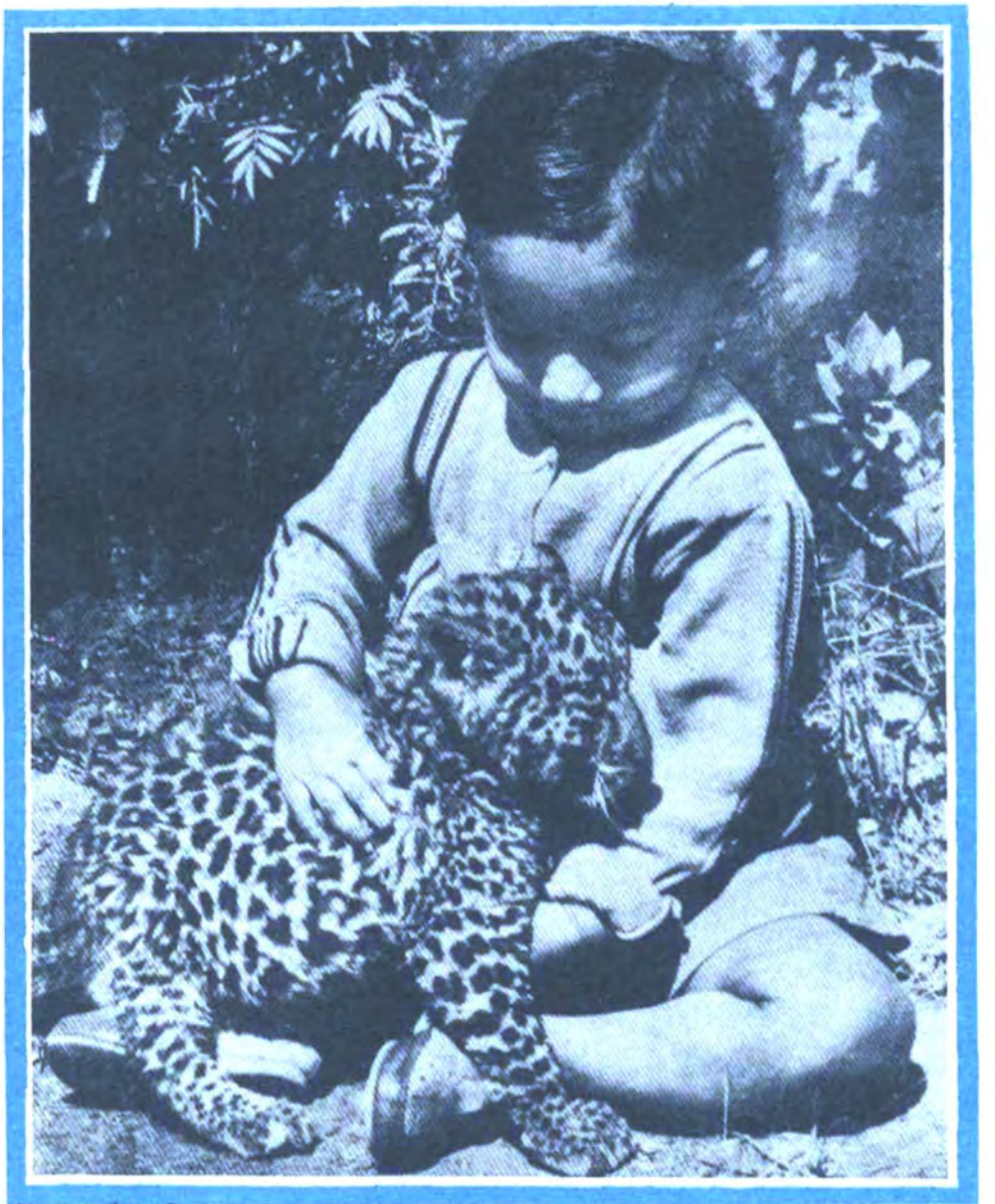

পি ৩০এ ইন্দ্রাণী পার্ক
কলিকাতা-৩৩

আমিতো হেলায় বাঘেরে খেলাই

পুরস্কৃত
নাম

ফটো নামকরণ প্রতিযোগিতা ঃঃ পুরস্কার ২০ টাকা

★

* ফটো-নামকরণ ২০শে আগষ্ট '৭৪-এর মধ্যে পৌছানো চাই।
* ফটোর নামকরণ দু চারটি শব্দের মধ্যে হওয়া চাই এবং দুটো ফটোর নামকরণের মধ্যে ছন্দগত মিল থাকা চাই। নিচের ঠিকানায় পোস্ট-কার্ডেই লিখে পাঠাতে হবে। পুরস্কৃত নাম সহ বড় ফটো অক্টোবর '৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

চাঁদমামা

এই সংখ্যার কয়েকটি গল্প-সম্ভার

অমরবাণী	...	৮	ধরা পড়ল	...	৩৮
যক্ষপর্বত	...	৯	বিড়ালের চোখ	...	৪২
বন্ধু বিচ্ছেদ	...	১৭	বিদূষক	...	৪৭
কাঠঠোকরা	...	২৩	মহাভারত	...	৪৯
রাজার শ্যালক	...	২৮	মিত্রভেদ	...	৫৭
হরিনাথের পরিবর্তন	...	৩৩	বিশ্বের বিস্ময়	...	৬১

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ চিত্র

প্রতিবিম্ব

তৃতীয় প্রচ্ছদ চিত্র

সহেলী

Printed by B. V. REDDI at The Prasad Process Private Ltd., and Published by B. VISWANATHA REDDI for Chandamama Publications, 2 & 3, Arcot Road, Madras-600026. Controlling Editor : 'CHAKRAPANI'

Photo by: BRAHM DEV

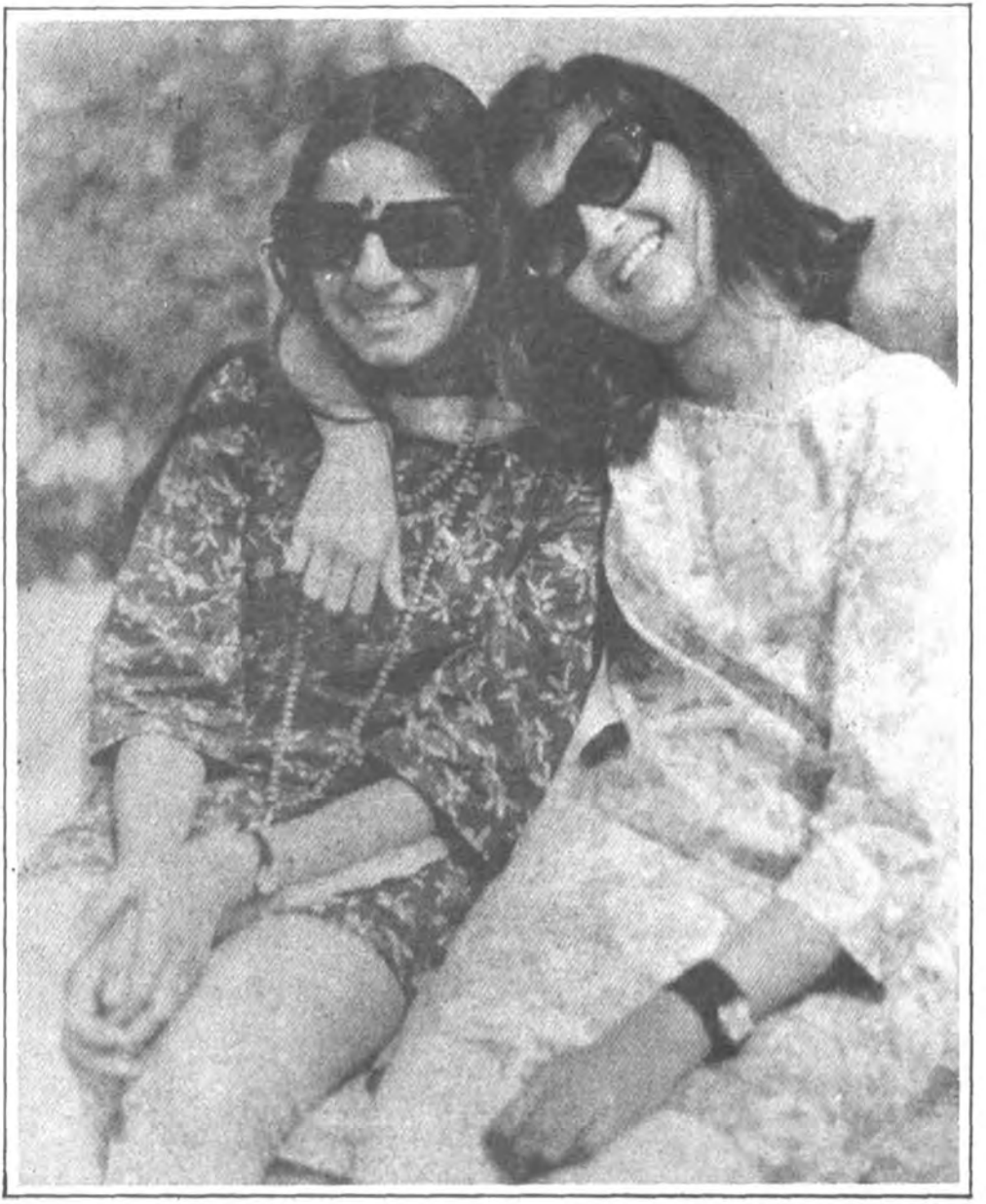

TWINS

Vapa